ড. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আরিফী

ড. আয়েয আল ক্বারনি

ফিরে এসো ক্ষমার পথে

শায়খ মুহাম্মদ আবদুর রহমান আরেফি
শায়খ আয়েয বিন আব্দুল্লাহ আল কারনী

অনুবাদ
জহির উদ্দিন বাবর
ফজলে রাব্বি

ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-১০)
গ্রাউন্ড ফ্লোর, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

সূচিপত্র

লেখকের ভূমিকা

সকল প্রশংসা মহামহিম আল্লাহর। দরূদ ও সালাম বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল ﷺ-এর প্রতি, তাঁর পরিবার-পরিজন ও সঙ্গী-সাথীদের প্রতি।

অন্ধকার পথ থেকে ফিরে আসা কিছু তওবাকারীদের চমকপ্রদ ঘটনাবলী বেশ উৎসাহব্যঞ্জক, মুগ্ধকর। কারণ—তাদের শিক্ষণীয় ঘটনাগুলো আমাদের সামনে সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভয়-জয় ও উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় মোড়ানো সরল জীবনের অনুপম চিত্র তুলে ধরে।

সূর্যের আগমন না ঘটলেও; পৃথিবী আলোকিত না হলেও, বেলাশেষে 'সত্যবিশ্বাসী' ব্যক্তি আল্লাহর পথেই ফিরে আসে।

তেমনি, পড়ন্ত বেলায় অস্তমিত সূর্যের বিদায় না ঘটলেও; রাতে জ্বলজ্বলে তারকারাজির আবির্ভাব না হলেও পরিশেষে তাওবাকারী আল্লাহর দিকেই রুজু হয়।

তওবাকারী—মাত্রই উন্মুখ হৃদয়ের অধিকারী, অধিক অশ্রুপাতকারী, অনুভূতিকাতর ও পরিমিত ভীতি লালনকারী...

তওবাকারী—সত্যবাদিতায় অগ্রগামী, কাজেকর্মে উদ্যমী, দৃঢ়চেতা মন ও সুষ্ঠু বিবেকের অধিকারী...

তওবাকারী—মিথ্যা দম্ভ ও অহংকার থেকে মুক্ত এবং সে অল্পতেই তুষ্ট..

তওবাকারী—ভয় ও আশা লালনকারী, ক্ষয় ও জয় এবং ধ্বংস ও মুক্তির মধ্যবর্তী...

তওবাকারী—হৃদয় ও মন যার প্রেমাস্পদের বিরহে কাতর। চেহারায় শোকের ছায়া অথচ অশ্রুতে বয় আনন্দের ফল্গুধারা...

তওবাকারী—যে মিলন ও বিচ্ছেদের মর্ম জানে। পাওয়া ও হারানোর বেদনা এবং গ্রহণ ও উপেক্ষার পরিণতি বোঝে...

তওবাকারী—যার প্রতিটি ঘটনায় লুকিয়ে থাকে শিক্ষা। যেমন, কবুতরের বাকবাকুম আওয়াজের অন্তরালে কখনো কান্না লুকিয়ে থাকে। পাখির চিরায়ত ডাকের আড়ালে কখনো লুকিয়ে থাকে বিষাদের করুণ সুর। বুলবুলির মিষ্টি ডাকের আড়ালেও লুকিয়ে থাকে শিক্ষা। তেমনি বিদ্যুতের উজ্জ্বল ঝলকানির পর শোনা যায় বিকট আওয়াজ!

তওবাকারী—স্রষ্টার আনুগত্যে যে তৃপ্তি খুঁজে পায়। ইবাদতের মাঝে দেখে সুন্দরের সমাবেশ এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান ও বিশ্বাসে লাভ করে অমীয় স্বাদ...

তওবাকারী—যার চোখের অশ্রুতে গল্প রচিত হয়। বেদনার কালিতে রচিত হয় কবিতামালা। কান্নার ফোঁটাই যার হয়ে যায় কথামালা!

তওবাকারী—স্বীয় সন্তানকে শত্রুর থাবা থেকে রক্ষাকারী মায়ের ন্যায়। গভীর সমুদ্রের ঘুর্ণিপাক থেকে নিরাপদে তীরে ফেরা ডুবুরীর ন্যায়। নিঃসন্তান অক্ষম পিতার ন্যায়, যাকে আগত পুত্রের সুসংবাদ দেয়া হয়েছে। কিংবা ফাঁসির দণ্ডাদেশপ্রাপ্ত গুরুতর অপধারী, যার কৃত অপরাধ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে...

তওবাকারী—যে নফসের প্রবৃত্তি ও গুনাহ থেকে নিজেকে মুক্ত করেছে। পাপাচারিতার বেড়ি থেকে কলবকে পবিত্র করেছে ও অন্ধকার থেকে আলোর পথে পা বাড়িয়েছে।

তওবাকারী—উচ্চবাক্যহীন নিরহংকার পাখির ন্যায় কিংবা ধুসর চাঁদ অথবা পুরনো তারকার ন্যায়; যার মাঝে বিশেষ সমারোহ নেই।

পাঠক! এসব তো গেলো তওবাকারীর কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা। বক্ষ্যমাণ বইয়ে আমি তওবাকারীর এমনই কিছু শিক্ষণীয় সত্য ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছি; যারা ইতোমধ্যেই তওবা করেছেন অথবা তওবা করে ফিরে আসতে চান, যারা আল্লাহর প্রতি অনুগত হতে চান কিংবা যারা তওবার দরোজা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন। বইটি সকলের জন্য। করুণাময়ের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন সবাইকে এ থেকে পূর্ণ উপকৃত করেন।

পরশমণির পরশে

বয়স তখন ত্রিশের কোঠা ছুঁইছুঁই। আমার প্রথম ছেলের জন্মের আগের কথা। সেই রাতগুলো আমি কখনও ভুলতে পারব না। গভীর রাত পর্যন্ত একটি ফার্ম হাউজে বসে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিতাম। রাতভর আমরা গল্পগুজবে কাটাতাম। সেখানে থাকত পরচর্চা, গালাগালি, বেফাঁস মশকরা। রাত যত গভীর হতো আমাদের আড্ডাবাজি তত চাঙা হতো। অন্যের অঙ্গভঙ্গি নকল করার ক্ষেত্রে আমার কোনো জুড়ি ছিল না। সম্ভবত বন্ধুবান্ধবের মধ্যে এমন কেউ ছিল না যার অঙ্গভঙ্গি নকল করে আমি অন্যদের হাসির খোরাক জুগাইনি।

সেই রাতে আমার দুষ্টুমিটা ছিল অন্যরকম। সন্ধ্যায় বাজার দিয়ে যাচ্ছিলাম। এক অন্ধ লোককে দেখলাম ভিক্ষা করছে। তার চলার পথে আমি নিজে পা রেখে দিলাম। এতে সে হোচট খেয়ে পড়ে গেল। সে তো আর আমাকে দেখেনি। তবে বেচারা পড়ে গিয়ে বিড়বিড় করে অনেক কিছু বলল। কী বলল সেটা আমি বুঝতে পারিনি। এই কৃতকর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত না হয়ে উল্টো অট্টহাসি দিচ্ছিলাম।

গভীর রাতে ঘরে ফিরে দেখলাম স্ত্রী আমার অপেক্ষায় বসে আছে। সেই সময় আমাকে তার খুবই দরকার ছিল। কারণ তখনই তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার কথা ছিল। আমাকে দেখে সে অনেকটা হতাশার সুরে জিজ্ঞেস করল, রাশেদ! তুমি কোথায় ছিলে?

আমি বললাম, এই তো বন্ধুদের সঙ্গে একটু আড্ডা দিচ্ছিলাম।

আমার স্ত্রী অনেক কষ্টে বলল, 'রাশেদ! আমার খুবই খারাপ লাগছে। সম্ভবত ডেলিভারির সময় ঘনিয়ে এসেছে।'

তার দুই চোখে অশ্রু ঝরছিল। নিজের ভুল কিছুটা বুঝতে পারলাম। স্ত্রীর সঙ্গে ভালো আচরণ করিনি এটা অনুধাবন হলো। ওই সময় তাকে সঙ্গ দেয়া, তার খোঁজখবর রাখা আমার জন্য জরুরি ছিল। অথচ আমি তখন রাতের পর

রাত আড্ডা দিতাম বন্ধুদের সঙ্গে। ভেতরে ভেতরে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকলাম।

সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রীকে নিয়ে রওয়ানা দিলাম হাসপাতালে। রাত শেষ প্রায়। সকাল হওয়ার একটু বাকি। নার্সরা আমার স্ত্রীকে ওয়ার্ডে নিয়ে গেল। আমি বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলাম। বসে বসে ঝিমুচ্ছিলাম। কিন্তু বেশি সময় বসে থাকতে পারলাম না। বাসায় চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এক নার্সকে ফোন নম্বর দিয়ে বললাম, সন্তান প্রসব হওয়ার পর যেন আমাকে ফোনে খবরটি দেয়।

বাসায় এসে আমি শুইয়ে পড়লাম। একটু পরই হাসপাতাল থেকে ফোন এলো। আমাকে ছেলে হওয়ার সুসংবাদ দেয়া হলো। সঙ্গে সঙ্গে আমি হাসপাতালে চলে গেলাম। আমি বাচ্চা দেখার জন্য অস্থির হয়ে পড়লাম। আমাকে বলা হলো, আগে আপনি দায়িত্বরত ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলে নিন।

আমি অনেক ফুরফুরে মেজাজে ছিলাম। সদ্য জন্ম নেয়া ছেলের মুখ দেখার আনন্দে ভেতরে ভেতরে ভেসে যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, ডাক্তারের সঙ্গে পরে কথা বলব আগে আমাকে আমার ছেলেকে দেখাও। আমি এখনই তাকে দেখতে চাই। কিন্তু তারা জানালো আগে ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

গেলাম দায়িত্বশীল ডাক্তারের কাছে। তিনি দীর্ঘ ভূমিকা টানলেন। বিপদে ভেঙে না পড়ার কথা বললেন। ভাগ্যের ওপর রাজি থাকতে বললেন। পরে ডাক্তার যে ভয়ানক সংবাদটি দিলেন তা শোনার জন্য আমি মোটেও প্রস্তুত ছিলাম না। তিনি জানালেন, সদ্য জন্ম নেয়া শিশুর চোখে কোনো আলো নেই। সম্ভবত সে আর কখনও পৃথিবীর আলো চোখে দেখতে পারবে না।

এই কথা শুনেই আমার মাথা ঘুরতে থাকল। চোখের সামনে ভেসে উঠল সেই অন্ধ ব্যক্তি গত রাতে যাকে রাস্তায় ফেলে দিয়ে হেসে মজা লুটছিলাম। এখন আমি কী করবো সেটা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলাম না। তবুও ডাক্তারদের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বেরিয়ে এলাম।

ছুটে চললাম স্ত্রীর রুমের দিকে। সে ছিল ধৈর্যের পাহাড়। আমাকে প্রায়ই বলত এভাবে মানুষকে নিয়ে হাসি-তামাশা না করতে। পরচর্চা আর পরনিন্দা থেকে বেঁচে থাকতে বলত। কিন্তু আমি তার কথা এক কানে শুনতাম আরেক কান দিয়ে বের করে দিতাম।

পরদিন আমরা হাসপাতাল থেকে রিলিজ পেলাম। আমি ছেলের নাম রাখলাম সালেম। আমার কল্পনার ক্যানভাসে স্ত্রীর নসিহতগুলো কিছু সময়ের জন্য ভেসে উঠত আর একটু পরই তা মিশে যেত। সত্য কথা বলতে কী সালেমের প্রতি আমার কোনো ভালোবাসা ছিল না। আমি তার দিকে কখনও ভালোভাবে তাকিয়েও দেখিনি। মনে মনে স্থির করে নিয়েছিলাম সে যেন আমাদের ঘরেই নেই এটা মনে করব। সে যখন কান্না করত আমি উঠে আরেক রুমে চলে যেতাম। তবে আমার স্ত্রী তাকে খুবই ভালোবাসত, আদর-যত্ন করত। সালেমের প্রতি আমার কোনো ঘৃণা ছিল না, তবে কোনো মমত্ববোধও ছিল না।

সালেম আস্তে আস্তে বড় হতে থাকল। সে হামাগুড়ি দিতে শিখল। তার হামাগুড়ি অন্যান্য বাচ্চাদের চেয়ে ভিন্ন ছিল। যখন তার বয়স এক বছরের বেশি হলো তখন সে আস্তে আস্তে হাঁটা শুরু করল। তার চলা দেখে বোঝা যাচ্ছিল পায়েও সমস্যা। তার এই প্রতিবন্ধিত্ব আমার মাথায় বাড়তি চাপ সৃষ্টি করলো।

সালেমের পরে আমার আরও দুই ছেলের জন্ম হয়, ওমর ও খালেদ। সময় কত দ্রুত চলে যায় তা অনুমানই করা যায় না। দেখতে দেখতে বছরের পর বছর চলে গেল। আমার সন্তানও বড় হয়ে গেল। কিন্তু আমার রাত আর দিনের মধ্যে কোনো পার্থক্য ছিল না। আমি ঘরে থাকতামই না। বেশির ভাগ সময়ই কাটত বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাবাজিতে। সেসব আড্ডার কেন্দ্রবিন্দু ছিলাম আমি। সবার মুগ্ধতা ছিল আমার প্রতি। একাই মাতিয়ে রাখতাম সেই আড্ডা।

আমার শত ত্রুটি সত্ত্বেও একজন ছিল যে আমাকে কখনও নিরাশ করেনি। সে সবসময় আমার জন্য দোয়া করত। আমার প্রতি কখনও অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেনি। কে ছিল সেই ব্যক্তি। সে ছিল আমার সন্তানের মা। আমার স্ত্রী, যে গভীর রাত পর্যন্ত বসে থাকত আমার অপেক্ষায়। আমি সালেম ছাড়া বাকি দুই ছেলেকে অসম্ভব ভালোবাসতাম। সালেমের সঙ্গে আমার তেমন কোনো সম্পর্ক ছিল না।

আমি তাকে ডেকেছি এমনটা খুব কম ঘটেছে। তার সঙ্গে অনেক অল্প কথা বলেছি। একমাত্র এই কারণে আমার স্ত্রী আমাকে কিছুটা অপছন্দ করতো।

সালেম ও তার ভাইয়ের এবার স্কুলে যাওয়ার বয়স। আমি সালেমকে অন্ধদের স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিলাম। সময়ের কোনো গুরুত্ব আমার কাছে

ছিল না। অফিসে যাওয়া, খাওয়া-দাওয়া আর বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডাবাজি করে রাত কাটানোই ছিল আমার কাজ।

সেদিন ছিল শুক্রবার। বেলা এগারটার সময় আমার ঘুম ভাঙল। আজ আমি নির্ধারিত সময়ের আগেই ঘুম থেকে উঠে গেছি। একটি ওলিমার দাওয়াতে যাওয়ার কথা ছিল। এজন্য আমি নতুন পোশাক পরে সুগন্ধি লাগিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছিলাম।

আমি ঘর থেকে বের হওয়ার সময় দেখলাম সালেম অঝোরে কাঁদছে। আমি একটু থেমে গেলাম। আমার জীবনে প্রথম সালেমকে কাঁদতে দেখছি। দশ বছর কেটে গেছে, কোনোদিন তার দিকে মনোযোগ দিইনি। ঘাড় ঘুরিয়ে কোনোদিন তার দিকে তাকিয়েও দেখিনি। আজও ইচ্ছা ছিল তার পাশ দিয়ে দ্রুত বেরিয়ে যাবো। সে তার মাকে ডাকছিল। কিন্তু নিজের অজান্তেই কী এক তাড়নায় আমি তার পাশে গেলাম। তাকে ধরে জিজ্ঞেস করলাম, সালেম! কাঁদছ কেন? সে আমার গলার আওয়াজ শুনেই কান্না বন্ধ করে দিলো। যখন সে বুঝতে পারলো আমি তার আশেপাশেই আছি তখন সে হাত এদিক-ওদিক দিচ্ছিল। যখন দেখল আমি তার হাতের নাগালে না তখন সে কিছুটা দূরে সরে গেল। আমি তার কাছে যেতে লাগলাম কিন্তু সে আমার থেকে সরে যেতে লাগল। হয়ত তার মনে ক্ষোভ, কোনোদিন তাকে অনুভব করিনি, ছুঁয়ে দেখিনি। তার মনে হয়ত কষ্ট, দশ বছরে কোনোদিন জিজ্ঞেস করনি এবার কেন জিজ্ঞেস করতে এসেছ? আমি যখন তার পেছনে পেছনে যেতে লাগলাম তখন সে ঘরের ভেতরে চলে গেল। আমিও তার পেছনে পেছনে ঘরের ভেতর গেলাম। আমি তাকে আদর করে জিজ্ঞেস করলাম, সালেম বাবা! কাঁদছ কেন? কিন্তু সে কাঁদছিল, যার কারণে কোনো উত্তর দিতে পারল না।

এবার আমি তার কাছে ভিড়লাম এবং কাঁধে হাত রাখলাম। আদর করে জিজ্ঞেস করলাম, বাবা! কেন কাঁদছ বলবে না!

আমি যখন বারবার কান্নার কারণ জানতে চাইলাম তখন সালেম কারণ বলতে লাগল।

তার কথা শুনে আমার মনের অবস্থা পাল্টে গেল। আমি হতভম্ব হয়ে গেলাম। আমি জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলাম। এবার তার কান্নার কারণ বলব কি! আজ তার ভাই ওমর শুইয়ে পড়েছিল। সে তাকে সময়ের আগে মসজিদে নিয়ে যেত। যেহেতু আজ জুমার দিন এজন্য তার ভয় ছিল দেরি

হয়ে গেলে হয়ত সামনের কাতারে জায়গা মিলবে না। সে প্রথমে ওমরকে ডাকল এবং পরে তার মাকে ডাকল। কিন্তু কেউই তার ডাকে সাড়া দিলো না। এজন্য সে কাঁদছে।

আমি তার চোখে অশ্রু দেখলাম। তার দৃষ্টিহীন চোখ অশ্রুতে ভেসে যাচ্ছিল। আমি তার বাকি কথাবার্তা আর শুনতে পারলাম না। তার দৃষ্টিহীন চোখে হাত বুলাতে বুলাতে বললাম, সালেম! তুমি কি শুধু এজন্য কাঁদছ যে মসজিদে যেতে দেরি হচ্ছে?

সে বলল, হ্যাঁ।

মানুষ অনেক গাফেল এবং দুর্বল। এক মুহূর্ত পরে তার ভাগ্যে কী আছে সেটা সে জানে না। জন্মান্ধ এই ছেলেটির সঙ্গে সামান্য কথাবার্তা আমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিলো। আমার জীবনে চলে এলো আমূল পরিবর্তন। আমি ভুলে গেলাম আমার প্রিয় বন্ধুদের। ওলিমার দাওয়াতে যেতে হবে সেই কল্পনাও অন্তরে স্থান পেল না।

আমি সালেমকে বললাম, তুমি চিন্তিত হয়ো না। আজ তোমাকে কে মসজিদে নিয়ে যাবে সেটা কি তুমি জানো?

সে বলল, হয়ত ওমর যাবে। কিন্তু সে তো সবসময় দেরি করে।

আমি বললাম, তুমি চিন্তা করো না, আজ তোমার বাবা তোমাকে হাত ধরে মসজিদে নিয়ে যাবে।

সালেম বিস্ময়ে হতবাক। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না আমার এই কথা। তার ধারণা ছিল আমি তার সঙ্গে মজা করছি। সে একটু সময় ভাবল। এরপর অঝরে কান্না শুরু করে দিলো। আমি তার চোখের অশ্রু মুছে দিলাম। গভীর মমতা দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলাম। পরে তাকে নিয়ে গেলাম গাড়িতে তোলার জন্য। কিন্তু সে কিছুতেই গাড়িতে উঠবে না।

সালেম বলল, আব্বা! মসজিদ কাছেই, গাড়ি লাগবে না। তাছাড়া মসজিদে হেঁটে গেলে প্রতি কদমে কদমে সওয়াব মিলবে।

সবশেষ কবে মসজিদে গিয়েছিলাম তা আমার মনে পড়ে না। তবে এটাই আমার জীবনে প্রথম অনুশোচনার জমিনে লুটিয়ে পড়া। এতো দীর্ঘ সময় আমার প্রভুর সঙ্গে সম্পর্কহীন থাকার লজ্জা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। পুরো মসজিদ মুসল্লি দিয়ে ঠাসা। আমি চেষ্টা করছিলাম আমার সালেমের জন্য প্রথম কাতারে একটু জায়গা যেন মিলে যায়। জুমার খুতবা শুনলাম।

নামাজের জন্য দাঁড়ালাম। সালেম আমার পাশেই দাঁড়াল। সত্য বলতে কী! আমি যেন তার ছায়ায় দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করছিলাম।

নামাজ শেষ হওয়ার পর সালেম আমাকে বলল, আমাকে একটা কুরআন শরিফ একটু ব্যবস্থা করে দিন। আমি বিস্মিত হলাম, সে কুরআন কীভাবে পড়বে! সে তো অন্ধ। আমি তার জন্য এক কপি কুরআন এনে দিলাম। এবার সে বলল, সুরা কাহাফ বের করে দিন। আমি কুরআনের পৃষ্ঠা উল্টাতে লাগলাম। কিছুক্ষণ উল্টানোর পর সুরা কাহাফ সামনে এলো। সে কুরআনে কারিম আমার হাত থেকে নিয়ে নিলো। অত্যন্ত আদবের সঙ্গে সে কুরআন শরিফ সামনে রেখে সুরা কাহাফ তেলাওয়াত করতে থাকল। তার দুই চোখ পুরোপুরিই অন্ধ, তবুও অত্যন্ত ধীর-স্থিরভাবে তেলাওয়াত করতে থাকল। এবার আমি বুঝতে পারলাম সে কিছু দেখতে পারে না কিন্তু পুরো সুরা মুখস্থ। তাকে নিয়ে আমার বিস্ময়ের আর কোনো শেষ থাকল না।

আমার প্রচণ্ড লজ্জাবোধ হচ্ছিল। আমি নিজেও কুরআনে কারিমের একটি কপি নিলাম। সুরা কাহাফ বের করলাম। পড়তে থাকলাম। যত পড়ছি ততই যেন আমাদের চোখ থেকে গাফলতের পর্দা সরে যাচ্ছে। পরে আমি প্রভুর কাছে বিনম্র দোয়া করলাম। নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলাম না। অতীতের গোনাহগুলো ভেসে উঠতে থাকল চোখের সামনে। সেই গোনাহগুলোর কথা মনে পড়ায় কাঁদতে থাকলাম শিশুদের মতো।

কেউ কেউ সুন্নত পড়ছিলেন। এজন্য চেষ্টা করছিলাম নিজের ওপর যেন নিয়ন্ত্রণ থাকে, তাদের নামাজে যেন ডিস্টার্ব না হয়। গণ্ডদেশ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। এই সময় অনুভব করলাম ছোট কোমল একটি হাত আমার চোখের পানি মুছে দিচ্ছে। সে ছিল আমার ছেলে সালেম। আমি তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। গভীর ভালোবাসা ও মমতার সঙ্গে তার দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মনে মনে বললাম, সালেম! তুমি তো অন্ধ না, অন্ধ হলাম আমি।

এরপর আমরা বাসার দিকে রওয়ানা করলাম। আমার স্ত্রী সালেমের জন্য চিন্তায় অস্থির ছিল। তার জানা ছিল না আজ সালেম আমার সঙ্গে জুমা পড়তে গিয়েছে। যখন সে জানতে পারল আমরা বাপ-বেটা জুমা পড়তে গিয়েছিলাম তখন তার আর খুশির অন্ত থাকল না।

এই ঘটনা আমার জীবনে এমন বিপ্লব ঘটিয়ে দিয়ে গেল যে, এরপর থেকে আমার জীবনে আর কোনো নামাজ কাজা হয়নি। আমি খারাপ সঙ্গ ত্যাগ করলাম। আমি বন্ধু বানালাম সবচেয়ে ভালো নামাজি ও মুত্তাকিদের। এবার

আমি ঈমানের স্বাদ লাভ করেছি। সৎ বন্ধুদের কাছ থেকে দীনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিখেছি।

এরপরের অবস্থা হলো, দীনের কোনো মজলিস, দীনের কোনো দরস কোথাও হলে আমি গিয়ে সেখানে হাজির হতাম। কুরআন তেলাওয়াত আমার নিত্য অভ্যাসে পরিণত হয়ে গেল। মাসে অন্তত একবার কুরআন খতম করতাম। আমার জিহ্বায় সবসময় আল্লাহর জিকির জারি হয়ে গেল। অতীতের গোনাহ স্মরণ হলে বেশি বেশি জিকির করতাম যাতে আল্লাহ তার নাম বেশি বেশি স্মরণ করার কারণে আমাকে অতীতের গোনাহ থেকে মুক্তি দেন। আমি লোকদের অন্তরে কষ্ট দিতাম! তাদেরকে নিয়ে মশকরা করতাম। মানুষের অন্তর ভেঙে দিতাম। কী অন্ধকার ছিল আমার সেই দিনগুলো!

এবার আমি পরিবারের সবার ঘনিষ্ঠ। আমার স্ত্রীর চেহারার উজ্জ্বলতা ফিরে এলো। আগে সে আমার চিন্তায় সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকত, এখন আমাকে দেখে সে সন্তুষ্ট, খুশিতে আটখানা। আর আমার ছেলে সালেম! তার তো খুশির কোনো সীমা-পরিসীমাই নেই। ঘরে যেন খুশির বান বইয়ে যেতে লাগল। আমার সারাক্ষণ কাটত সালেমের সঙ্গে। আমি আল্লাহর অনুগ্রহের জন্য তার কৃতজ্ঞতা আদায় করতাম।

একদিন আমার কিছু সাথী এসে বললেন, আমরা দীনের দাওয়াতের জন্য দূরদেশে যেতে চাই, আপনিও আমাদের সঙ্গে চলুন। দাওয়াতে দীনের মতো দীনের গুরুত্বপূর্ণ বিধান থেকে দূরে সরে ছিলাম। দাওয়াতে দীনের কাজে বের হবো সেই কল্পনাও কোনোদিন অন্তরে জাগেনি। বন্ধুরা পীড়াপীড়ি করতে লাগল। আমি যাবো কি না এটা স্থির করতে পারছিলাম না। স্ত্রীর কাছে পরামর্শ চাইলাম। আমার ধারণা ছিল সে যেতে দেবে না। কিন্তু ঘটল উল্টো ঘটনা। সে আমাকে সাহস দিয়ে বলল, আমি বিভিন্ন অপকর্ম করতে বন্ধুদের নিয়ে দেশ-বিদেশ ঘুরে বেরিয়েছ, এবার আল্লাহর দীনের পয়গাম নিয়ে বের হবে এটা তো অনেক আনন্দের বিষয়।

আমি সালেমের সঙ্গে কথা বললাম। তাকে সফরের উদ্দেশ্যের কথা বললাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী মত? সে ছোট ছোট বাহু দ্বারা আমার গলায় জড়িয়ে ধরে বলল, আব্বু! দাওয়াত ও তাবলিগ তো প্রত্যেক মুসলমানের দায়িত্ব। আপনি আল্লাহর রাস্তায় দাওয়াত দেয়ার জন্য অবশ্যই বের হবেন। অবশেষে আমি তাবলিগের সফরে বের হয়ে গেলাম।

বাড়ি থেকে বেরিয়েছি তিন মাসের বেশি। এর মধ্যে কয়েকবার ফোনে বাড়িতে কথাবার্তা হয়েছে। কিন্তু সালেমের সঙ্গে কোনো বারই কথা বলা হয়ে উঠেনি। আমার ইচ্ছা ছিল তার গলার স্বর শুনব। অন্য ছেলেদের সঙ্গে কথা বলেছি, শুধু তার সঙ্গে কথা বলা হয়নি।

যখন আমি স্ত্রীকে ফোন করতাম সে আমাকে সালেমের কথা শোনাতো। আমি যখন সফর শেষে বাড়ি ফিরব তখন স্ত্রীকে ফোন করলাম। জিজ্ঞেস করলাম, ছেলেরা কেমন আছে, সালেম কী করে। কিন্তু এবার স্ত্রীর গলার স্বর কিছুটা ভারী ভারী মনে হলো। এতদিন যে স্বতস্ফূর্ততার সঙ্গে সে আমার সঙ্গে কথা বলত তা যেন আজ বাকি নেই। আমি বললাম, সালেমকে সালাম দিও আর বলিও আমি আসছি। স্ত্রী ইনশাআল্লাহ বলে চুপ হয়ে গেল এবং ফোন রেখে দিলো। আমি ঘরে ফিরে এলাম। দরজায় করাঘাত করলাম। মনে মনে ভাবছিলাম দরজা খুলতেই সালেম দৌড়ে আসবে। কিন্তু আমার কল্পনা ভুল প্রমাণিত হলো। দরজা খুলতেই দেখলাম সালেম নেই। আমার চার বছরের ছেলে খালেদ এসে হাতে জড়িয়ে ধরল বাবা বাবা করে।

আমার স্ত্রী এগিয়ে এলো। কিন্তু তার চেহারা মলিন। প্রত্যেক বার তার চেহারায় হাসির ছাপ দেখলেও এবার তা চোখে পড়ল না। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তোমার কী হয়েছে? তুমি ভালো আছো তে!

বলল : না, আমার কোনো সমস্যা নেই।

এরপর হঠাৎ সালেমের কথা মনে পড়ল। জিজ্ঞেস করলাম, সালেম কই?

আমার স্ত্রী মাথা নুইয়ে ফেলল এবং কথার কোনো উত্তর দিলো না। তার চেহারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমি চিৎকার দিয়ে বলতে লাগলাম, সালেম সালেম! তুমি কই!

ছোট ছেলে খালেদ এগিয়ে এলো এবং আধোআধো স্বরে বলতে লাগল, বাবা! সালেম জান্নাতে চলে গেছে আল্লাহর কাছে। আমার স্ত্রী ধৈর্যের পাহাড়। কিন্তু আমি আমার নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়লাম।

জানতে পারলাম আমার আসার দুই সপ্তাহ আগে সালেমের জ্বর হয়েছিল। তার মা তাকে হাসপাতালে ভর্তি করেছিল। অভিজ্ঞ ডাক্তার চিকিৎসা করেছেন কিন্তু জ্বর বাড়তেই থাকল। এভাবে একদিন তার প্রাণপাখি উড়ে গেল। সে গিয়ে মিলিত হলো মাওলা পাকের সঙ্গে।

সত্য হতে বিচ্যুতির পরিণতি

সত্যের পথ অবলম্বনের প্রবল ইচ্ছা ছিল তার। ইসলামের সৌন্দর্যগুলো দেখে তার খুশির কোনো সীমা ছিল না। তিনি বললেন, আজই আমাকে ইসলামে প্রবেশ করাও। সত্যিই এটি একটি মহান ধর্ম।

তার নাম জাবলা বিন আইহাম। তিনি ছিলেন গাসলান গোত্রের সরদার। ঈমানের সজীবতা তাকে ইসলাম গ্রহনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। তিনি ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন এবং সেই সময়কার খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি.-এর কাছে একটি পত্র লিখলেন।

আমি কি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারি? আমি ইসলাম গ্রহণ করেছি।

ওমর রাযি. এবং অন্যান্য মুসলমানরা জাবলা বিন আইহামের ইসলাম গ্রহণের খবর পেয়ে যারপর নেই খুশি।

আমিরুল মুমিন জবাবে লিখলেন- তুমিও সেইসব অধিকার ভোগ করতে পারো যা ইসলাম আমাদেরকে দিয়েছে। পাশাপাশি সেইসব বিধিবিধানও তোমার ওপর আরোপিত হবে যা পালনে ইসলাম আমাদের জন্য বাধ্য করেছে

জাবলা তার পাঁচশ অশ্বারোহী নিয়ে রওয়ানা করলেন। যখন তিনি মদিনায় প্রবেশ করছিলেন তখন তার গায়ে ছিল সোনায় খচিত পোশাক। মাথায় ছিল শাহি মুকুট। সেই মুকুটে ছিল হিরা-জহরতের ছড়াছড়ি। তার বাহিনীর সবাই ছিল জাঁকজমকপূর্ণ পোশাকে আবৃত।

তিনি মদিনায় প্রবেশ করলেন। মদিনার শিশু-বৃদ্ধ এমনকি নারীরাও ঘরের জানালা দিয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল তাদের আসার দৃশ্য। তিনি ওমর রাযি.-এর দরবারে পৌঁছলেন। খলিফা তাকে স্বাগত জানালেন এবং নিজের পাশে নিয়ে বসালেন।

হজের মৌসুমে আমিরুল মুমিনিন হজের জন্য বের হলেন। জাবলাও তাঁর সঙ্গে হজ পালনের ইচ্ছা করলেন। আমিরুল মুমিনিন বায়তুল্লাহ তওয়াফ

করছিলেন। জাবলাও ছিলেন সঙ্গী। বনু ফাজারাহ গোত্রের দরিদ্র এক লোকের পা জাবলার লুঙ্গিতে লেগে গেল। এতে জাবলা তার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকালেন। পরে এতো জোরে থাপ্পড় লাগালেন এতে দরিদ্র লোকটির নাকের হাড় ভেঙে রক্ত ঝরতে লাগল।

শেষ পর্যন্ত বিষয়টি ওমর রাযি.-এর আদালত পর্যন্ত গড়াল। ওমর রাযি. জাবলাকে ডাকালেন। জিজ্ঞেস করলেন, জাবলা! তুমি তওয়াফের সময় তোমার আরেক ভাইয়ের চেহারায় থাপ্পড় বসালে কেন? এতে তো তার নাকের হাড় ভেঙে গেছে।

জাবলা রাগের স্বরে বললেন, এই বদলোকটি আমার লুঙ্গি পা দিয়ে ময়লা করে দিয়েছে। বায়তুল্লাহর সম্মানবোধ না থাকলে তো আমি তার গর্দান উড়িয়ে দিতাম।

ওমর রাযি. : তুমি তোমার দোষ স্বীকার করেছ। এখন তুমি তোমার এই ভাইকে যেভাবে পারো সন্তুষ্ট করাও। না হলে তোমার কাছ থেকে বদলা নেয়া হবে। সে তোমার চেহারায় থাপ্পড় বসাবে যেভাবে তুমি থাপ্পড় দিয়েছ।

জাবলা : জনাব ওমর! আমি গাসসানের বাদশা। এই সামান্য ব্যক্তি আমার কাছ থেকে প্রতিশোধ নেবে?

ওমর রাযি. : অবশ্যই নেবে। ইসলাম তোমাদের উভয়ের মধ্যে সমতা বিধান করেছে। তোমাদের দুজনের মধ্যে কোনো পার্থক্য হওয়ার থাকলে সেটার মাপকাঠি একমাত্র তাকওয়া।

জাবলা : আমার এমন ইসলামের প্রয়োজন নেই। আমি পুনরায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করবো।

ওমর রাযি. : ইসলামের নির্দেশ হলো যে ইসলাম থেকে বেরিয়ে যায় সে মুরতাদ। আর মুরতাদকে হত্যা করতে হয়। তুমি যদি আবার খ্রিস্টধর্মে ফিরে যাও তবে তোমাকে হত্যা করা হবে।

জাবলা : আমিরুল মুমিনিন! আমাকে আগামীকাল পর্যন্ত সময় দিন যাতে আমি একটু ভেবে দেখতে পারি।

ওমর রাযি. : যাও, তোমাকে আগামীকাল পর্যন্ত সুযোগ দেয়া হলো।

রাত তখন গভীর। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। নিস্তব্ধ শহর। জাবলা চুপিচুপি উঠলেন এবং নিজের বাহিনীসহ মক্কা থেকে পালিয়ে গেল। পরে তিনি কুস্তুনতুনিয়া গেলেন এবং খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করল। সেখানে তার কিছুদিন

কাটল। জীবনের রঙগুলো ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ঈমানের স্বাদ পেয়ে যে সজীবতা তার মধ্যে ফিরে এসেছিল তা কিছুদিনের মধ্যেই শেষ হয়ে গেল। অন্তর ছেয়ে গেল মরিচায়। আক্ষেপ আর অনুশোচনা তাকে কুরেকুরে খেতে থাকল। অল্প দিন ইসলামে থাকার সেই সোনালি অধ্যায়গুলো মনে পড়তে থাকল। ইসলাম ত্যাগের জন্য তার আফসোসের কোনো শেষ থাকল না।

জাবলা তখন কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে কান্না করতেন আর এই কবিতা আবৃত্তি করত :

لطمة عار من الاشراف تنصرت

ضرر لها صبرت لو فيها كان وما

'সম্মানী লোকেরা একটি থাপ্পড়ের লজ্জায় খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেছে। যদি তারা ধৈর্য ধারণ করতো তাহলে কোনো ক্ষতি হতো ন।'

نخوة ولجاج منها تكنفنى

بالعوز الصحيحة العين لها بعت و

'আমাকে ঘিরে ফেলেছে হঠকারিতা ও অহংকার; এজন্য সুস্থ চোখকে অন্ধের বিনিময়ে কিনে নিয়েছি।'

ولهتنى تلدنى لم امى ليت فيا

عمر لى قال الذى القول الى رجعت

'আফসোস! মা যদি আমাকে জন্ম না দিতেন! যদি আমি কবুল করে নিতাম যা বলেছিলেন ওমর!'

بقفرة المخاص ارعى ليتنى يا و

مضر و ربيعة فى اسير كنت و

'আফসোস! আমি যদি জঙ্গল ও নির্জন প্রান্তরে উট চরাতাম... যদি আমি মুদার এবং রবিয়ার বন্দি হয়ে থাকতাম...

معيشة ادنى بالشام لى ليت يا و

والبصر السمع ذاهب قومى اجالس

> 'আফসোস! আমার সন্ধ্যাটা যদি কাটত অতি সাধারণভাবে; আমি আমার সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্ধ ও বধির হয়ে বসে থাকতাম!'

অনেকেই চায় তার দিন-রাত যেন ইসলামের বিধানমতে কাটে। কিন্তু অহংকার তার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। আর এ কারণে সে ইসলামের নিদর্শনের কোনে তোয়াক্কা করে না। পায়জামা টাকনুর উপরে রাখে না। অহংকারের কারণেই দাড়ি রাখে না। মুশরিকদের বিরোধিতা করে না। সে তার নিজের বাহিক্য চাকচিক্যকে তার প্রভুর আনুগত্যের ওপর বেশি প্রাধান্য দেয়।

এমনিভাবে কোনো কোনো নারী পর্দার ব্যাপারে সবসময় শিথিলতা দেখায়। সবসময় নিজের রূপ-সৌন্দর্যের প্রকাশ ঘটায়। পাতলা কাপড় পরে বের হয়। আঁটোসাটো কাপড় পরে শরীরের ভাঁজগুলো পরপুরুষকে দেখায়। এভাবে সে আল্লাহর অবাধ্য কাজে লিপ্ত হয়। তাদেরকে নসিহত করলে অহংকার দেখিয়ে তুড়ি মেরে আপনার কথা উড়িয়ে দেবে। অথচ আল্লাহর রাসুল ﷺ বলেছেন-

> 'যার অন্তরে সরিষা পরিমাণ অহংকারও থাকবে সে জান্নাতে যাবে না।' *[মুখতাসার তারিখে দিমাশক; সহিহ মুসলিম, হাদিস নং (১৪৭) ৯১]*

অন্তর নির্গত কথার প্রভাব

এক বৃদ্ধ মহল্লার মসজিদের ইমাম ছিলেন। তিনি সারা জীবন নামাজ আর কুরআনের তালিমে কাটিয়েছেন। একদিন তিনি অনুভব করলে মসজিদে নামাজির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এটা ভেবে তিনি খুবই পেরেশান হলেন। একদিন তিনি কয়েকজন নামাজিকে জিজ্ঞেস করলেন, মসজিদে নামাজির সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে কেন? আপনারা এর কী কারণ মনে করেন? বিশেষ করে যুবকরা তো মসজিদের ধারেকাছেও আসে না।

নামাজিরা জবাব দিলেন, লোকেরা খেলাধুলা ব্যস্ত। তারা ড্যান্সিং হলে নাচগানে সময় কাটায়।

ইমাম সাহেব বিস্মিত হয়ে বললেন, 'ড্যান্সিং হল' এটা কী!

এক নামাজি বললেন, এটা অনেক বড় একটি কামরা। সেখানে একটি বড় মঞ্চ থাকে। মেয়েরা সেজেগুজে হেলেদুলে সেই মঞ্চে নাচগান করে। আর সামনে বসে থাকা দর্শকরা হাততালি দেয়, আনন্দ উপভোগ করে।

বৃদ্ধ ইমাম বললেন, আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, যেসব লোক নৃত্যরত নারীদের দেখে তারা কি মুসলমান?

লোকেরা বলল, হ্যাঁ তারা মুসলমান।

ইমাম সাহেব অসন্তুষ্টি প্রকাশ করে বললেন, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। এটা তো অনেক মারাত্মক গোনাহের কাজ। আমাদের উচিত প্রজ্ঞার সঙ্গে তাদেরকে নসিহত করা এবং সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করা।

ইমাম সাহেবের কথা শুনে লোকেরা খুবই পেরেশান হলেন।

তারা বলেন, মাওলানা! আপনি কি নাচঘরে গিয়ে লোকদের নসিহত করবেন?

ইমাম সাহেব মসজিদ থেকে বেরিয়ে গেলেন। বললেন, আপনারাও আমার সঙ্গে আসুন, আমি ড্যান্সিং হলে গেলাম।

লোকেরা অনেক চেষ্টা করল ইমাম সাহেবকে ব্যর্থ এই প্রচেষ্টা থেকে ফেরাতে।

এক নামাজি বললেন, হজরত! ড্যান্সিং হলে যাবেন না। এটা গোনাহের বাজার। সেখানকার লোকজন হিংস্র প্রাণীর মতো। শয়তান তাদের ওপর সওয়ার হয়ে আছে। আপনি সেখানে গেলে বেয়াদবরা আপনাকে নিয়ে হাসি-তামাশা করবে। আপনি তাদের বিদ্রুপের বস্তু হতে যাবেন না।

ইমাম সাহেব উঁচু গলায় বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! আমরা কি মুহাম্মদ ﷺ থেকে উত্তম? কালেমায়ে হকের তাবলিগ করতে গিয়ে আল্লাহর রাসুলের ওপর কি পরীক্ষা আসেনি? তাঁকে নিয়ে কি হাসি-বিদ্রুপ হয়নি? তাকে কি যাদুকর ও পাগল বলা হয়নি? তাঁর রাস্তায় কি কাঁটা বিছিয়ে দেয়া হয়নি? এমন কী নির্যাতন আছে যা তাঁর ওপর করা হয়নি? তাহলে আমরা আর কী!

পরে ইমাম সাহেব এক নামাজির হাত ধরে বললেন, আমাকে ড্যান্সিং হলের ঠিকানা বলে দাও। ইমাম সাহেব দৃঢ় মন নিয়ে এগিয়ে চললেন। তিনি ড্যান্সিং হলে পৌঁছলেন। নাচঘরের মালিক তাকে দূর থেকেই দেখলেন। তিনি ভাবছিলেন ইমাম সাহেব হয়ত কোথাও ওয়াজের জন্য যাচ্ছেন। কিন্তু ইমাম সাহেব সঙ্গীসহ এগিয়ে এলেন ড্যান্সিং হলের দিকে। মালিক গিয়ে দরজায় দাঁড়ালেন। বললেন, আপনি কী চান?

ইমাম সাহেব : আমি ড্যান্সিং হলে আসা লোকদের ওয়াজ করতে চাই।

হলের মালিক খুব বিস্মিত হয়ে তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর এই অনুরোধ গ্রহণ করার ব্যাপারে অপারগতা প্রকাশ করলেন। ইমাম সাহেব অত্যন্ত নম্র ভাষায় কথাবার্তা বললেন এবং এর বিনিময়ে আখেরাতে প্রতিদানের সুসংবাদ দিলেন। কিন্তু মালিক সাফ জানিয়ে দিলেন তা সম্ভব নয়।

ইমাম সাহেব বললেন, আপনি আর্থিক ক্ষতির কথা চিন্তা করছেন। ঠিক আছে আমি আপনার শো'তে যত টাকা ভাড়া আসে সব পরিশোধ করে দেব।

ইমাম সাহেব পুরো শো'য়ের টাকা পরিশোধ করে দিলেন। মালিক রাজি হলেন। বললেন, আগামীকাল যখন শো শুরু হবে তখন আসবেন। পরদিন শো শুরু হলো। লোকজন পুরো মনোযোগের সঙ্গে শো দেখছিলেন। শয়তানি সব দৃশ্য দেখে সবাই খুব মজা পাচ্ছিলেন আর হাততালি দিচ্ছিলেন।

এক পর্যায়ে বিরতির পর যখন শো চালু হলো লোকেরা দেখতে পেলেন বৃদ্ধ ইমাম সাহেব মঞ্চে একটি চেয়ারে বসে আছেন।

ইমাম সাহেব বিসমিল্লাহ পড়ে শুরু করলেন। আল্লাহর হামদ ও সানা পড়লেন। রাসুল ﷺ-এর ওপর দরুদ পড়লেন। তিনি ওয়াজ শুরু করলেন। লোকেরা হতভম্ব, কী ঘটছে কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। একজন আরেকজনের দিকে শুধু তাকাচ্ছিল। কিছু লোক হাসছিল। কেউ সমালোচনা করছিল। কেউ বিদ্রুপ করছিল। কিন্তু ইমাম সাহেব এসবের প্রতি কোনো ভ্রুপেক্ষ করলেন না। তিনি ওয়াজ করে যেতে থাকলেন।

এক পর্যায়ে উপস্থিতির মধ্যে একজন দাঁড়িয়ে উঁচু আওয়াজে বললেন, ভাইয়েরা! আপনারা একটু চুপ করুন, তিনি কী বলছেন শুনুন। এতে সবাই চুপ হয়ে গেল। চারদিকে নীরবতা ছেয়ে গেল। এবার চারদিকে শুধু ইমাম সাহেবের আওয়াজই শোনা গেল।

তিনি প্রথমে সবার সামনে যেসব আয়াতে ভয় দেখানো হয়েছে সেগুলো পড়লেন। তাঁর তেলাওয়াতে পাহাড়ে যেন কম্পন সৃষ্টি হলো। এরপর তিনি মানবতার নবী মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর হাদিস পড়লেন। ঈমান ও সৎকাজের বরকত সম্পর্কে জানালেন। অসৎকর্মশীলদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ব্যাখ্যা করলেন।

তিনি বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! তোমরা অনেক বছর জীবন কাটিয়েছ। এই জীবনে তোমরা পরম দয়ালু আল্লাহর অবাধ্যতা করেছ। তোমরা গাফলতের স্বপ্নে বিভোর হয়ে আছ। একটু ভাবো, নিজেদের অবস্থার কথা একটু চিন্তা কর। আমাকে বল, প্রভুর অবাধ্যতা করে তোমাদের কী মিলেছে? তোমাদের আমলনামায় গোনাহ লিপিবদ্ধ হয়েছে। তোমাদের গোনাহের স্বাদ এখন কোথায়? নিঃসন্দেহে স্বাদ আর অবশিষ্ট নেই। কিন্তু কালো দাগগুলো রয়ে গেছে। অচিরেই তোমাদেরকে এই গোনাহের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হবে। সেই দিন খুব কাছে যেদিন সবকিছু বিলীন হয়ে যাবে।

সূর্য বিবর্ণ হয়ে যাবে। চাঁদ-তারা উদয়-অস্তের কাব্য আর রচনা করবে না। আকাশ মেঘলা রূপ ধারণ করবে। চারদিকে অন্ধকার ছেয়ে যাবে। ভূকম্পন শুরু হবে। জমিনে ফাটল দেখা দেবে। থেমে যাবে সমুদ্রের উত্তালতা আর শয়তানের অবাধ বিচরণ। পানি প্রবাহ হওয়ার কথা ভুলে যাবে। ফুল ভুলে যাবে ফোটার কথা। চারদিকে শুধু মৃত্যুর বিভীষিকা চোখে পড়বে। একমাত্র আল্লাহর পবিত্র সত্তা ছাড়া আর কারও কোনো অস্তিত্ব থাকবে না।

প্রিয় ভাইয়েরা! তোমরা একটু ভাবো, তোমাদের দায়িত্ব কী ছিল আর তোমরা কী করছ? নিজের কৃতকর্মের কথা কি একবার ভেবেছ? অচিরেই কোথায় যাচ্ছো সেটা কি একবারের জন্যও ভেবেছ? তোমরা দুনিয়ার আগুনের যন্ত্রণা সইতে পার না। অথচ আখেরাতের আগুনের তাপ এর চেয়ে ৭০ গুণ বেশি। জাহান্নামের আগুনকে ভয় কর। আর সময় নষ্ট করো না। একটু অনুশোচনার অশ্রু ঝরাও। নিজের প্রভুকে সন্তুষ্ট করার কথা ভাবো। তোমরা প্রভুর সামনে কীভাবে মুখ দেখাবে? তোমরা কি একবারের জন্যও ভেবেছ তোমাদের ওপর আল্লাহর কত অনুগ্রহ!

তাঁর রহমত কি সারাক্ষণ তোমাদের ওপর অবতীর্ণ হয় না! তোমাদের গোনাহের খবর কি তাঁর কাছে যায় না? তিনি তোমাদের ওপর অনুগ্রহ বর্ষণ করছেন আর তোমরা সারাক্ষণ ডুবে আছো তার অবাধ্যতায়। নিজেদের অকৃতজ্ঞতা দেখ আর তাঁর অনুগ্রহের কথা একটু ভাবো।

বৃদ্ধ ইমাম কথাগুলো বলছিলেন হৃদয়ের গভীর থেকে। কথাগুলো ছিল খুবই প্রভাবময়। আর প্রতিটি কথা যেন তীর হয়ে গিয়ে বিঁধছিল উপস্থিত লোকদের মনে। এতে লোকদের মনের ছাঁচ আস্তে আস্তে পাল্টে যাচ্ছিল। জীবনের প্রকৃত বাস্তবতা দিনের আলোর মতো সবার সামনে স্পষ্ট হচ্ছিল। তারা কান্না শুরু করল। চারদিকে কান্নার রোল পড়ে গেল।

ইমাম সাহেব এবার তাদেরকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, প্রিয় ভাইয়েরা! নিজেদের মধ্যে মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এসো। গোনাহ থেকে দূরে থাকো। এমনভাবে পাল্টে যাও যেভাবে পাল্টে যায় ঋতু। আমাদের প্রভু অনেক মহান, তাঁর অনুগ্রহের ভাণ্ডার অনেক প্রশস্ত। প্রিয় বন্ধুরা! আল্লাহর ওপর ভরসা রাখো। এরপর দেখ প্রভু কীভাবে তোমাদের ওপর দ্রুত সন্তুষ্ট হয়ে যান আর তোমাদেরকে সম্মানের মুকুট পরিয়ে দেন।

সবশেষে ইমাম সাহেব দোয়া করলেন- হে রাব্বুল আলামিন! আমি তোমার দরবারের ভিখারি। তোমরা দরবারে হাত পেতে কেউ খালি হাতে ফিরে না। আমাদের ভিক্ষার হাত তোমার দরবারে পাতা। তুমি অসীম দয়ালু, তোমার দানের ভাণ্ডার অনেক সমৃদ্ধ। ক্ষমা করে দেয়া তোমার মহান গুণ। তুমি তওবা ও ক্ষমা প্রার্থনাকারীদের অনেক পছন্দ কর। আমরা গোনাহগার বান্দা তোমার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা চাচ্ছি। তুমি আমাদের গোনাহ ক্ষমা করে দাও। আমাদের থেকে মন্দ স্বভাব দূর করে দাও। আমাদেরকে নেকির জীবন দান কর।

ইমাম সাহেব দোয়া করছিলেন আর ড্যান্সিং হল যেখানে একটু আগেও অশ্লীল নৃত্য প্রদর্শিত হচ্ছিল সেখানে 'আমিন' 'আমিন' রব উঠল। ইমাম সাহেব ভাবগাম্ভীর্যের সঙ্গে চেয়ার থেকে উঠলেন এবং বের হয়ে মসজিদের দিকে রওয়ানা করলেন। সঙ্গে ছুটল ড্যান্সিং হলের লোকজন। এবার আর মসজিদে মুসল্লির কোনো অভাব থাকল না।

প্রিয় পাঠক! এই বিপ্লব কীভাবে সম্ভব হলো তা কি আপনারা জানেন? যারা একসময় ইমাম সাহেবকে নিয়ে বিদ্রুপ করত তারাই পরবর্তী সময়ে কীভাবে তওবা করে নেক পথের পথিক হয়ে গেল?

এটা ছিল হক পথে তাবলিগের অবদান। আল্লাহ আমাদেরকে সৎকাজের প্রতি আহ্বানের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আফসোস! আমরা আজ আমাদের দায়িত্ব ভুলে গিয়ে বোঝা হয়ে পৃথিবীতে বাস করছি। আমাদেরও উচিত সৎকাজের দাওয়াত দেয়া।

সস্তা পণ্যে মহামূল্যবান সম্পদ খোয়া

তিনি প্রসিদ্ধ আরবি কবি ছিলেন। তখন তিনি বার্ধক্যে উপনীত। সারা জীবন কাটিয়েছেন ভ্রষ্টতায়। কিন্তু শেষ বয়সে হঠাৎ পাল্টে গেল যায় জীবনের গতি। ভেতরে জ্বলে উঠে ইসলামের মশাল। তিনি ইয়ামামা থেকে বের হলেন। উদ্দেশ্য নবী করিম ﷺ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ইসলামে দীক্ষিত হওয়া। তিনি তার বাহনকে ফেরালেন মক্কার দিকে। মনে মনে অনেক খুশি এবার সাক্ষাৎ হবে শেষ নবীর সঙ্গে। তিনি আপন মনে চলছেন এবং নবীজির শানে কবিতা আবৃত্তি করছেন-

الم تغتمض عيناك ليلة ارمدا

وعادك ما عاد السليم المسهدا

'নিঃসন্দেহে তুমি রাত কাটিয়েছ চক্ষু উঠা রোগীর মতো। তোমার চোখ এখন মুহূর্তের জন্য বন্ধ হয়নি। তোমার অবস্থা হলো ওই লোকের মতো যে সাপের ভয় ও চোখের রোগে আক্রান্ত অবস্থায় রাত যাপন করে।'

يممت اين السائلى ايهاذا الله

موعدا يثرب اهل فى لها فان

'আমার উটের গন্তব্য কোথায় যারা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করে তারা খবরদার! তোমাদের জানা উচিত, তার ওয়াদার স্থান হলো ইয়াসরিব (মদিনা)।'

ذكره وترون لا ما يرى نبى

انجد والبلاد فى لعمرى اغار

'তিনি এমন নবী, তিনি যা দেখেন তোমরা তা দেখ না। আমার বয়সের শপথ! তাঁর আলোচনা দিক-বিদিক ছড়িয়ে পড়েছে এবং তার অনুসারী সবখানে রয়েছে।'

محمد وصاة تسمع لم اجدك

اشهدا واوصى حيث الاله نبى

'নিঃসন্দেহে তুমি আল্লাহর নবী মুহাম্মদ ﷺ-এর উপদেশ শোননি এবং লোকেরা এ ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়।'

التقى من بزاد ترحل لم انت اذا

تزودا قد من الموت بعد قيت ولا

'যখন তুমি দুনিয়ায় ভালো কাজের পাথেয় সংগ্রহ করনি আর মৃত্যুর পর ওই লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে যে দুনিয়া থেকে তাকওয়ার পাথেয় নিয়ে গেছে।'

كمثله تكون لا ان على ندمت

ارصدا كان لما ترصد لم انك و

'তুমি নিজের বিচ্যুতির জন্য পেরেশান, তার মতো কেন হলাম না। তিনি যে প্রস্তুতি নিয়েছেন সে প্রস্তুতি কেন নিলাম না!'

যত সামনে অগ্রসর হচ্ছেন নবীজির প্রতি তার ভালোবাসা ও আকর্ষণ তত বাড়তে থাকল। হাতে তৈরি মূর্তি পূজা ছেড়ে প্রকৃত স্রষ্টার গোলাম হওয়ার পাক্কা ইচ্ছা তিনি পোষণ করলেন।

যখন তিনি মদিনার কাছাকাছি পৌঁছেন তখন মুশরিকরা তার পথ আগলে দাঁড়ালো। বলল, তুমি কোথায় যাচ্ছো? বৃদ্ধ কবি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিলেন, আমি রাসুল ﷺ-এর কাছে যাচ্ছি ইসলাম গ্রহণের জন্য। মুশরিকরা ভাবল, তার মতো শক্তিমান কবি মুহাম্মদ ﷺ-এর অনুসারী হয়ে গেলে আমাদের মূর্তির পূজারি আস্তে আস্তে কমতে থাকবে। এক হাসসান ইবনে সাবেত রাযি.-এর কারণেই আমরা তটস্থ। তিনি তার কবিতার আকর্ষণ দিয়ে লোকদের ইসলামের দিকে টেনে নিচ্ছেন। এই বৃদ্ধ কবি আশআ বিন কায়েস ইসলাম গ্রহণ করলে তো তাদের শক্তি আরও বহুগুণে বেড়ে যাবে।

আমাদেরকে নাকানি-চুবানি খাওয়াবে। তারা সম্মিলিতভাবে কবিকে ধর্মান্তর থেকে ফেরাতে চাইল। তাকে বলল, আশআ! তোমার বাপ-দাদার ধর্ম মুহাম্মদের ধর্মের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আশআ জবাব দিলেন, না মুহাম্মদের ধর্ম শ্রেষ্ঠ।

এবার মুশরিকরা তাকে ইসলামের পথ থেকে ফেরানোর জন্য আরেকটি অস্ত্র ব্যবহার করল। তারা বলল, আশআ! মুহাম্মদ তো ব্যভিচারকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

আশআ : আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি। আমার নারী দিয়ে কী প্রয়োজন!

মুশরিকরা : মুহাম্মদ তো মদও হারাম করেছেন।

আশআ : মদ তো মানুষের বুদ্ধিসুদ্ধি লোপ করে দেয়। অনেক ভালো মানুষের অপদস্থতার কারণ হয় এই মদ। আমার মদের কোনো প্রয়োজন নেই।

যখন তারা দেখল আশআ অনেক কঠিন মনের মানুষ তখন তারা ভিন্ন এক কৌশল অবলম্বন করল। তারা এই কবির সামনে লোভের ফাঁদ পাতল। তারা বলল, তুমি মদিনার পথ ছেড়ে বাড়িতে চলে যাও। এর বিনিময়ে তোমাকে আমরা একশ উট দেব। কথায় আছে কাদায় হাতির পাও পিছলে যায়। লোকের এই বিশাল ফাঁদে বৃদ্ধ কবিও পিছলে গেল। শয়তান তার অন্তরে ঢেলে দিলো, এত বিশাল অফার ছাড়া ঠিক হবে না। সুতরাং তিনি মুশরিকদের অফারে রাজি হয়ে গেলেন। কথামতো মুশরিকরা তাকে একশ উট দিলো। তিনি এই উট নিয়ে বাড়ির পথ ধরলেন।

একসঙ্গে এতো উট পেয়ে বৃদ্ধ কবি খুশিতে আত্মহারা। তিনি মনে মনে ভাবছেন, কবিত্বের শক্তির কারণে আমি আজ বড়লোক। কিন্তু মহান স্রষ্টার হিসাব-নিকাশ ভিন্ন। তিনি যা স্থির করেন তা অনেকের কল্পনায়ও আসে না। এই বৃদ্ধ কবির ক্ষেত্রেও ঘটল তাই। এক জায়গায় তার বাহনের উটটি পিছলে পড়ে গেল। তিনি পড়লেন নিচে। এতে প্রাণ হারালেন বৃদ্ধ কবি। পুরস্কার হিসেবে পাওয়া উটগুলো ছুটে গেল এদিক-সেদিক আর তার নিথর মরদেহ পড়ে রইল জায়গাতেই। এভাবেই সস্তা পণ্যের বিনিময়ে হারাতে হলো মহামূল্যবান ঈমান।

সে আমার আলোর দিশারী

রঙিন বাতিগুলো জ্বলে উঠল। সড়কে গাড়ির দীর্ঘ সারি লেগে গেল। এদিকে ওয়াদার আর মাত্র কয়েকটি মিনিট বাকি। এখন আমার কী করা উচিত ভাবতে লাগলাম। রাগ আর দুশ্চিন্তায় আমার অবস্থা খরাপ। ট্রাফিক সিগন্যাল ছোটার নামগন্ধও নেই। ঘড়ির কাঁটার টিকটিক করে এগিয়ে যাওয়া হৃদপিণ্ডে যেন আঘাত করে চলেছে।

আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে বেজে উঠল সবুজ বাতি। আমি আঙ্গুল রাখলাম গাড়ির হর্নে। আমার এই কাজে আশপাশের লোকেরা বিরক্ত হচ্ছিল। আমি দ্রুতগতিতে একটির পর আরেকটি গাড়ি অতিক্রম করছিলাম। আমার ভয়ঙ্কর ড্রাইভিং আশপাশের লোকদের অন্তরে ভয় ঢুকিয়ে দেয়। যেকোনো সময় অন্য গাড়ির সঙ্গে ধাক্কা লাগতে পারে।

আমার চেষ্টা ছিল পারলে উড়ে চলে যাই। কিন্তু কাজ হলো না। সময় চলে গেল। আমার বন্ধুকে পেলাম না। নিঃশ্বাস ফেলছিলাম আর ভাবছিলাম কোথায় পাবো তার সন্ধান! আহ! যদি তার ঠিকানাটি থাকত!

এবার আমার গাড়ি স্বাভাবিক গতিতে চলতে লাগল। আমি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। পাশের গাড়ির হর্ন শুনে আমার ব্যবচ্ছেদ হলো। তার ওপর আমার রাগ উঠল। হাতের ইশারায় বললাম একটু শান্তভাবে চল। একটু আগেই আমার বিপজ্জনক ড্রাইভিংয়ের কথা নিজেই ভুলে গেলাম।

আমি মনে মনে স্থির করলাম আজকের রাত ঘরেই কাটাব। এটা আমার জন্য ভালো সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ আমার একমাত্র মেয়েটি ছিল অসুস্থ। তার পাশে থাকার প্রয়োজন। ফিরতি রাস্তা ধরলাম। একটু সামনে এগিয়ে একটি ভিডিও সেন্টারের পাশে গাড়ি থামালাম। অনেকগুলো ফিল্ম কিনে বাড়ির পথে রওয়ানা করলাম।

দরজা খুলতেই স্ত্রীকে বললাম, দ্রুত আমাকে চা আর বিস্কুট দাও। সে আমাকে উপদেশ দিতে লাগল- আহমদ! আল্লাহকে ভয় কর। আমি তার

নসিহত এক কানে শুনলাম আরেক কান দিয়ে বের করে দিলাম। টেলিভিশনের রিমোট হাতে নিয়ে ভিডিও ফিল্ম চালিয়ে দিলাম। গানের স্বরে সারা ঘর আন্দোলিত হতে থাকল। আমার স্ত্রী হতাশার সুরে আমাকে বলল, আহমদ! আল্লাহকে ভয় কর। পরে সে রুম থেকে বেরিয়ে গেল। গানের প্রতি সে খুবই বিরক্ত ছিল।

আমি চায়ের পেয়ালায় মনের সুখে চুমুক দিচ্ছিলাম আর চোখ ছিল টেলিভিশনের দিকে। ফিল্ম প্রথমটা শেষ হয়ে দ্বিতীয়টাও শেষ হওয়ার পথে। এমন সময় রুমের দরজায় নক। কে যেন নড়াচড়া করছে বুঝতে পারলাম। কে কে বলতে বলতে দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকল আমার অসুস্থ মেয়ে। আমার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলল- বাবা! আল্লাহকে একটু ভয় কর। এই কথা বলে সে শনশন করে বেরিয়ে গেল। আমি পেছন থেকে ডাকছি- সারা! সারা! কিন্তু ভ্রুক্ষেপ না করে চলে গেল।

আমি বেরিয়ে পাশের রুমে গিয়ে দেখলাম আমার অসুস্থ মেয়ে তার মাকে জড়িয়ে ধরে ঘুমাচ্ছে। তাহলে আমার কলিজার টুকরা মেয়ের অবয়ব ধারণ করে কে এলো এতো রাতে! বুঝতে পারলাম আমাকে সতর্ক করা হয়েছে। আমি টিভি বন্ধ করে দিলাম।

আমার গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল। শরীর থেকে ঘাম ঝরতে থাকল। কয়েক মুহূর্ত আমার ভেতর দিয়ে কী বয়ে গেছে সেটা বুঝানো যাবে না। আমার কানে শুধু সেই কথাটিই বাজছে- 'বাবা! আল্লাহকে একটু ভয় কর। বাবা! আল্লাহকে একটু ভয় কর।' তার নিষ্পাপ চেহারা আমার সামনে ভাসতে লাগল এবং তার ভয় প্রদর্শন আমার অন্তরে ক্রিয়া সৃষ্টি করল।

না জানি কত দিন কেটে গেছে নামাজের ধারেকাছেও যাইনি। আহ! আমি আমার মহান প্রভুর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকরা করছি। আমার সকাল-সন্ধ্যা কাটত তার অবাধ্যতায়। আমি পুরোপুরি গাফলতের চাদরে আবৃত ছিলাম। আমার যৌবনের রঙিন দিনগুলো খারাপ ফিল্ম আর সিগারেটের ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল। আমার সবচেয়ে উপকারী, সবচেয়ে মহান সত্তার চৌকাট ছেড়ে দিয়েছিলাম। যখনই আমি তার দরবার থেকে দূরে সরে গেছি তখনই আমার ওপর ভর করেছে শয়তান।

এমন কী গোনাহ আছে আমি করিনি! এমন কোনো পাপাচার আছে যা আমাকে ছুঁয়ে যায়নি! কিন্তু এক মুহূর্তের মধ্যে কী হলো! আমার আদরের মেয়ের অবয়বে সতর্কবার্তায় আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। আমার গাফলত

চলে গেল। আমি গভীর রাতে একা একা মনের দহনে জ্বলে-পুড়ে ছারখার হচ্ছিলাম। এক পর্যায়ে নিজেকে আর সংবরণ করতে পারিনি। পড়ে গেলাম মাটিতে।

অতীতের গোনাহের চিত্র আমার চোখের সামনে সিনেমার পর্দার মতো ভেসে উঠল। প্রতিটি খারাপ কাজের জন্য যেন আমার আদরের মেয়ে ডেকে বলছে, বাবা! আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহকে ভয় কর!

এই মুহূর্তে বরকতময় আজানের আওয়াজ ভেসে এলো কানে। মনে হলো দূর পর্যন্ত নূরের চাদর বিছিয়ে দেয়া হচ্ছে। মাথা চিনচিন করছে। শরীর কাঁপছে। মুয়াজ্জিন বলছিলেন-

الصلوة خير من النوم

'ঘুমের চেয়ে নামাজ উত্তম।'

মন সাক্ষ্য দিলো মুয়াজ্জিন যা বলছেন তা দুনিয়ার সবচেয়ে সত্য। আফসোস! আমি সারা জীবন এই সত্যকে ভুলে থেকেছি!

সঙ্গে সঙ্গে উঠলাম। ওজু করে মসজিদের দিকে রওয়ানা করলাম। মসজিদের পথ ধরে চলছিলাম অচেনা লোকদের মতো। ভোরের স্নিগ্ধতা যেন আমাকে ডেকে বলছে- এতদিন কোথায় ছিলে! আকাশে পাখিরা উড়ছিল আর আমাকে যেন মিষ্ট স্বরে বলছিল- 'স্বাগতম' 'স্বাগতম'।

আমি মসজিদে ঢুকলাম। দুই রাকাত নামাজ পড়লাম। কুরআনে কারিম তেলাওয়াত করতে থাকলাম। কুরআন পড়তে গিয়ে মাঝে মাঝে থেমে যাচ্ছিলাম। কারণ সুদীর্ঘকাল কুরআন কারিম একমুহূর্তের জন্যও খুলে দেখা হয়নি।

আমি অনুভব করছিলাম কুরআন আমার সঙ্গে কথা বলছে। আমাকে উদ্দেশ্য করে অভিমান করে বলছে, তুমি এতদিন আমাকে ছুঁয়েও দেখনি। তাহলে এখন কেন? আমি কি প্রভুর বাণী নই? আমি সুরা জুমারের এই আয়াত বারবার পড়তে থাকি-

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ
اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا ۚ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝

'বলুন, হে আমার বান্দারা! যারা নিজেদের ওপর জুলুম করেছ তোমরা আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ মাফ করেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *[সুরা জুমার, আয়াত ৫৩]*

আমি বিস্মিত হলাম! সমস্ত গোনাহকে এক ঘোষণায় ক্ষমা করে দিয়েছেন মহান রাব্বুল আলামিন! আমাদের মহান ও প্রিয় আল্লাহ আমাদের ওপর কতটাই না দয়ালু!

মনে চাচ্ছিল কুরআন তেলাওয়াত অব্যাহত রাখি। কিন্তু মুয়াজ্জিন ইকামত বলতে শুরু করলেন। আমিও দাঁড়িয়ে গেলাম কাতারে। কিন্তু নিজেকে মনে হচ্ছিল অচেনা। আমি নামাজ সম্পন্ন করলাম। সূর্যোদয় পর্যন্ত মসজিদেই বসে থাকলাম। রুমের দরজা খোলা ছিল। আমি আমার স্ত্রী ও মেয়ে সারাকে একনজর দেখলাম। তারা উভয়েই শুইয়ে ছিল। আমি চুপিচুপি ফিরে এলাম এবং নিজের কাজে বেরিয়ে গেলাম।

সকাল সকাল কাজে বেরিয়ে যাওয়া আমার অভ্যাসে ছিল না। আমাকে সকাল সকাল জাগতে দেখে সঙ্গী-সাথীরা বিস্মিত হলো। তারা এতো সকালে উঠায় আমাকে মোবারকবাদ জানালো। তাদের কথাবার্তার জবাবে আমি কিছু বললাম না। আমি তাকিয়ে ছিলাম ইবরাহিমের পথ চেয়ে। ইবরাহিম আমার সহকর্মী। তিনি আমাকে সবসময় নসিহত করতেন। অত্যন্ত ভালো মানুষ। কাজেকর্মেও খুবই গোছালো।

ইবরাহিম এলেন। আমি দাঁড়িয়ে গেলাম। আমাকে দেখে তিনিও বিস্মিত হলেন। বললেন, আহমদ আপনি!

আমি তাকে হাত ধরে বললাম, আপনার সঙ্গে কিছু কথা আছে। তিনি বললেন, ঠিক আছে অফিসে চলেন সেখানে বসে বলবেন। আমি বললাম না, রেস্ট রুমে চলেন সেখানে বলব। তিনি আমার দিকে কান পেতে বসলেন। আমি গত রাতের ঘটনা বিস্তারিত বললাম। প্রথমে তিনি আমার দিকে বিস্ময়ের দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তার চোখ দুটি ছলছল করছিল। পরে তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বললেন, আল্লাহ আপনার ওপর রহম করেছেন। আপনার মধ্যে হেদায়াতের বীজ রোপন করে দিয়েছেন। আপনাকে গোনাহের পথ থেকে রক্ষা করেছেন।

আজ অফিসে আমি অনেক ফুরফুরে। গতরাতে ঘুম হয়নি তবুও ক্লান্তির কোনো ছাপ নেই। পুরোদমে কাজ করছি। এক সহকর্মী এসে জিজ্ঞেস

করলেন, আজ আপনাকে খুব ফুরফুরে মনে হচ্ছে এর কারণ কী! আমি বললাম, আজ ফজরের নামাজ দিয়ে দিন শুরু করেছি। এজন্য কাজে প্রশান্তি অনুভূত হচ্ছে।

বেচারা ইবরাহিম আমার সহকর্মী। আমি ক্লান্ত হয়ে যেতাম। তিনি একাই সব কাজ করতেন। তার মধ্যে ছিল না বিন্দু পরিমাণ বিরক্তির ছাপ। এটা ছিল মূলত ঈমানি শক্তি। আজ যেন আমিও সেই শক্তি অনুভব করছি।

ইবরাহিম বললেন, আপনি গতরাতে ঘুমাননি, আজ চলে যান। আপনার কাজ আমি করে দেব। কিন্তু আমি দেখলাম জোহরের নামাজের আর সামান্য সময় বাকি। ইতোমধ্যে মুয়াজ্জিন আজান দিলেন। আমি ওজু করে মসজিদে চলে গেলাম। প্রথম কাতারে গিয়ে নামাজ পড়লাম। কী যে প্রশান্তি অনুভব হচ্ছে বলে বোঝানো যাবে না। আগে এই জোহরের নামাজের সময় অফিস থেকে বেরিয়ে বাজারে চলে যেতাম যেন নামাজ পড়তে না হয়। বাজারের হৈ-হুল্লোড়ের মধ্যে আরাম খুঁজে বেড়াতাম। অথচ এই মসজিদে কী প্রশান্তি!

নামাজ শেষে বাড়ির পথ ধরলাম। রাস্তায় গাড়িতে বসে বসে আদরের টুকরো সারার কথা ভাবছিলাম। তার কী অবস্থা হবে! তার আরোগ্য হবে তো! ঘরে পৌঁছে দরজার কাছে গিয়ে সারার মাকে ডাকলাম। কিন্তু সাড়াশব্দ পেলাম না। ভেতরে ঢুকে দেখলাম আমার স্ত্রী অঝোরে কাঁদছে। আমাকে দেখে আরও হাউমাউ করে কাঁদতে থাকল। জানাল, সারা আর নেই। সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে মাওলায়ে পাকের দরবারে।

আমার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। আমি সারাকে জড়িয়ে ধরলাম। কিন্তু কোথাও প্রাণের কোনো স্পন্দন নেই। নিথর ঠান্ডা দেহ পড়ে আছে বিছানায়। আমাকে যেন ডেকে বলছে, প্রিয় বাবা! অনেক দেরি করে ফেলেছ। অনেক পরে তোমার বোধোদয় হয়েছে।

আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না আমার আদরের চটপটে মেয়েটি এভাবে হঠাৎ চলে যাবে। আমার কাছে এটা স্বপ্নের মতো মনে হলো। কিন্তু নিজেকে যখন বাস্তবে আবিষ্কার করলাম তখন দুই চোখ বেয়ে শুধু অশ্রুই ঝরতে লাগল। মৃত্যুর পর তার চেহারার লাবণ্য যেন আরও বেড়ে গেছে। আমি প্রিয় সেই চেহারাটির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে রইলাম। আমার অশ্রু গড়িয়ে পড়ছে আর মুখে পড়ছি- লা হাউলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

আমি ইবরাহিমকে ফোন দিলাম। আমাদের সারা আল্লাহর প্রিয় হয়ে গেছে সেই খবর দিলাম। সঙ্গে সঙ্গে ইবরাহিম চলে এলেন। আমার স্ত্রী অন্য

মহিলাদের নিয়ে সারাকে গোসল করালো। তাকে কাফন পরানো হলো। এবার শেষ বিদায়ের পালা। আমার স্ত্রী আমাকে ডাকলো। আমি গেলাম। সারার প্রিয় মুখটি শেষবারের মতো দেখতে বললো। আমি কান্নায় ভেঙে পড়লাম। ঢলে পড়ে যেতে লাগলাম। তবে কোনোরকম নিজেকে সামলালাম। সারার মায়াবি মুখটির দিকে চেয়ে থাকলাম অপলক। চোখ দিয়ে পানি ঝরছে আর মনে মনে প্রতিজ্ঞা করছি, সারা! তোমাকে কথা দিচ্ছি যতদিন বেঁচে থাকব আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হবো না।

সারার মা নিজেকে স্থির রাখতে পারছে না। কান্নায় ভেঙে পড়ছে। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম। ধৈর্য ধরতে বললাম। তাকে বললাম, আল্লাহ পাক কুরআনে কারিমে বলেছেন-

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِاِيْمَانٍ اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَآ اَلَتْنٰهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ ؕ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾

'যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সঙ্গে মিলিত করে দেব এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও কমাবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের জন্য দায়ী।' *[সুরা আত-তুর, আয়াত ২১]*

সারার জানাজা সম্পন্ন হলো। আমরা তাকে নিয়ে কবরস্থানে গেলাম। আমি নিজেই কবরে নামলাম। সেই মুহূর্তে আমি অদৃশ্য থেকে একটি আওয়াজ শুনছিলাম, কেউ যেন ডেকে বলছে, আহমদ! এটা তো তোমার ঠিকানা। একদিন তুমি অন্যের কাঁধে চড়ে এখানে আসবে। এই ঘরের জন্য তোমার কী প্রস্তুতি। আমি আনমনা হয়ে যাচ্ছিলাম। হঠাৎ ইবরাহিমের ডাকে আমার সম্বিৎ ফিরে এলো। তিনি ডাক দিয়ে বললেন, আহমদ লাশ ধর। আমি কলিজার টুকরো সারাকে নিজ হাতে কবরে শুইয়ে দিয়ে পড়লাম-বিসমিল্লাহি ওয়া আলা মিল্লাতি রাসুলিল্লাহ...

বিরল পরীক্ষা

হজরত কাব ইবনে মালেক রাযি. তাবুক যুদ্ধে স্বশরীরে শরিক হননি। রাসুলুল্লাহ ﷺ এজন্য তাঁর প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। এটা এতটাই ভয়াবহ বিষয় ছিল যে, কাব ইবনে মালেক রাযি.-এর জীবন অন্ধকারে ছেয়ে গেল। সেই ঘটনাটি তাঁর নিজ মুখেই শুনুন-

তখন আমার কাছে আছে দুটি উট। বাহনও ছিল। স্ত্রী ছিল, খাবার-দাবারের ব্যবস্থাও ছিল। এজন্য আমার অন্তরে কিছুটা স্বস্তি ছিল। আমার মনে মনে ধারণা ছিল, এই কাফেলা চলে গেলেও আমার কাছে দ্রুতগামী উট আছে, পরে রওয়ানা দিয়েও তাদেরকে ধরতে সক্ষম হবো। আজ না কাল এভাবে কয়েক দিন কেটে গেল। ইতোমধ্যে কাফেলা রওয়ানা হয়ে চলে গেছে। তখন মদিনায় আমি নিজেকে মুনাফিকদের কাতারে দেখতে পেলাম, যাদের ব্যাপারে আগে থেকেই সন্দেহ ছিল; অথবা রোগী, বৃদ্ধ ও অপরারগ মানুষদের কাতারে নিজেকে মনে হলো। তখন আমাকে আমার অন্তর ভর্ৎসনা করতে লাগল, সবাই চলে গেল তুমি গেলে না। কিন্তু তখনও আমার মধ্যে কোনো দুশ্চিন্তা ছিল না। ভাবতাম, কাফেলা চলে গেছে চার দিন পাঁচ দিন হয়েছে তাতে কী, এখনও রওয়ানা করলে আমি তাদেরকে গিয়ে ধরতে পারব। এই ভাবনার মধ্যে থাকতে থাকতেই হঠাৎ একদিন খবর পেলাম নবী করিম ﷺ অস্বাভাবিকভাবে দ্রুত ফিরে আসছেন। এবার যখন ফিরে আসার খবর পেলাম তখন আর আমার যাওয়ার দ্বারা কী লাভ!

তাবুকের কাফেলা ফিরে এলো। নবী করিম ﷺ-এর অভ্যাস ছিল, কোনো সফর থেকে ফিরে এলে প্রথমে মসজিদে যেতেন। সেখানে দুই রাকাত নামাজ পড়ে কিছু সময় মসজিদে বসতেন। পরে ঘরে যেতেন। নবী করিম ﷺ ফিরে আসার পর যারা তাবুক যুদ্ধে যেতে পারেননি তারা এসে এসে নিজের অপারগতার কথা বলছিলেন। সেই লোকদের সংখ্যা প্রায় ৮০ জন। তারা কেউ এসে বললেন, আমার এই অপারগতা ছিল, কেউ বললেন আমার

অমুক সমস্যা ছিল; রাসুল ﷺ তাদের বাহ্যিক কথার ওপর সিদ্ধান্ত নিলেন। তাদের কথা মেনে নিলেন। তাদেরকে আবারও শপথবাক্য পাঠ করালেন। তাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলেন। এই ৮০ জন চলে যাওয়ার পরও আরও মুসলমান রাসুলের কাছে এলেন এবং নিজ নিজ অপারগতার কথা বলে অব্যাহতি নিলেন।

কাব রাযি. বলেন, আমিও মনে মনে বাহানা খুঁজছিলাম যা বলে রাসুলের কাছে গিয়ে পার পেয়ে যাব। এ ব্যাপারে স্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শও করলাম। তারা বলল, কোনো একটি সমস্যার কথা বলে পার পেয়ে যাও। কিন্তু আমার অন্তরে একটি বিষয় ঘুরপাক খাচ্ছিল; বিষয়টি তো সাধারণ কোনো মানুষের সঙ্গে না, সরাসরি আল্লাহর বন্ধুর সঙ্গে। আমি যদি কোনো বাহানা করে এখন পার পেয়েও যাই তবুও তো আল্লাহ সব জানেন। তিনি তো অন্তরের গভীরে কী আছে সেটাও জানেন। আমি যে মিথ্যা বলছি সেটা তো তিনি জেনে যাবেন। আবার এই ভাবনাও এলো, আমি যদি সত্য বলি আর তাতে রাসুল ﷺ অসন্তুষ্টও হন তবুও তো আল্লাহ এটা জানবেন আমি সত্য বলেছি। এতে তিনি নবীজির অন্তরে আমার ব্যাপারে ভালোবাসা ঢেলে দেবেন।

সুতরাং আমি আল্লাহর সন্তুষ্টিকে সামনে রেখে নবীজির দরবারে হাজির হলাম এবং সত্য কথা বলে দিলাম। নবী করিম ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন তাবুকে যাওনি? আমি বললাম, হে আল্লাহর হাবিব! অনেক ভালো অবস্থায় আমি ছিলাম। আমার দুটি বাহনও ছিল। আমি চাইলে চলেও যেতে পারতাম। কিন্তু আজ না কাল এভাবে করতে করতে সময় চলে গেল। অলসতা ছাড়া আর কোনো প্রতিবন্ধকতা ছিল না। যখন এভাবে খোলামেলা কথা বললাম তখন আল্লাহর রাসুল ﷺ বললেন, ঠিক আছে তোমার বিষয়টি আল্লাহর ওপর ছেড়ে দিলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ব্যাপারে সেখান থেকে কোনো ঘোষণা না আসবে ততক্ষণ আমি চুপ থাকব।

নবী করিম ﷺ কাব রাযি.কে বলে দিলেন, আজ থেকে কোনো মুসলমান তোমার সঙ্গে কথা বলবে না। যতক্ষণ আল্লাহর পক্ষ থেকে তোমার ক্ষমার ব্যাপারে ঘোষণা না আসবে ততক্ষণ এই নিষেধাজ্ঞা বহাল থাকবে। কাব রাযি. বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমার মতো কি আরও কেউ আছে? তখন বলা হলো, হেলাল বিন উমাইয়া এবং আরেক সাহাবি মিরার রাযি.ও আছেন। অর্থাৎ সব মিলিয়ে আমরা তিনজন যাদের ব্যাপারে এই সিদ্ধান্ত হয়েছে।

আমি ঘরে এলাম। কেউ আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললো না। এমনকি স্ত্রী পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথা বললো না। তিনি বলেন, আমার কাছে অতি কাছের মানুষেরা অনেক পর হয়ে গেল। চেনা পৃথিবী অচেনা লাগতে লাগল। প্রতিটি মুহূর্ত কাটতো গভীর ভাবনায়। এই অবস্থায় মারা গেলে কী পরিণতি হবে আমার-এটা নিয়ে সবসময় ভাবতাম। আল্লাহ রাসুল ﷺ যেখানে আমার সঙ্গে কথা বলছেন না, তিনি যেখানে আমার সঙ্গে এই আচরণ করছেন সেখানে আমি কীভাবে ক্ষমার আশা করতে পারি! এই চিন্তা আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। আমার প্রতিটি রাত, প্রতিটি দিন অসহনীয় যন্ত্রণায় কাটতে থাকলো। বিশাল দুনিয়া যেন আমার ওপর সংকীর্ণ হয়ে গেল।

তিনি বলেন, সেই অবস্থায় আমি আমার এক কাজিনের কাছে গেলাম। সে আমার বন্ধুও ছিল এবং তার সঙ্গে খুবই ভালোবাসার সম্পর্ক ছিল। সে তখন কাজ করছিল। আমি তাকে বললাম, তুমি কি জানো আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে ভালোবাসি? আমি দুইবার বলার পরও সে চুপ রইল। আমি যখন তৃতীয়বার একই কথা বললাম তখন সে বলে দিলো- 'আল্লাহ ও তাঁর রাসুলই ভালো জানেন।' সে এভাবে কথা বলবে এটা আমার ধারণায় ছিল না। আমার বিশ্বাস ছিল, সে আমাকে সান্ত্বনা দেবে, স্বস্তির কথা বলবে। ভাবছিলাম সে বলবে, তুমি তো ভালো মানুষ, কিন্তু তোমার সঙ্গে কেন এমন আচরণ করা হলো!

তিনি বলেন, এ কথা দ্বারা আমার কান্না আসতে লাগলো। এত ভালোবাসা, এত সম্পর্ক সব আজ হারিয়ে গেছে! আমি এভাবে পর হয়ে গেলাম! আমি কী ধরনের পরীক্ষায় আছি সেটা কিছুটা টের পেলাম। এরই মধ্যে নবী করিম ﷺ-এর কাছ থেকে বার্তা এলো, আমি আমার স্ত্রীর কাছেও যেতে পারবো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, যেতে পারবো না এর উদ্দেশ্য কী? তাদেরকে তালাক দিয়ে দেবো নাকি বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবো? বলা হলো, তালাক দিতে হবে না, তাদের থেকে আলাদা থাকবে। তাদের ধারেকাছেও যাবে না।

আমার সঙ্গে আরও যে দুজন তাদের একজন ছিলেন বৃদ্ধ। তার স্ত্রী নবী করিম ﷺ-এর দরবারে গিয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার স্বামী বৃদ্ধ। তার সেবার প্রয়োজন। আপনি অনুমতি দিলে আমি তার সেবা করতে পারব। নবী করিম ﷺ বললেন, হ্যাঁ, খাবার-দাবারের ব্যবস্থা করে দিতে পারবে, তার সঙ্গে মেলামেশা করতে পারবে না। তখন তিনি বললেন, আমার স্বামী তো বয়সে এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে তার জৈবিক চাহিদাই

আর অবশিষ্ট নেই। যেদিন থেকে আপনি এই নির্দেশ দিয়েছেন সেদিন থেকে দেখছি রাত-দিন শুধু কান্নাকাটিই করছে।

কাব রাযি. বলেন, কেউ কেউ আমাকে পরামর্শ দিলেন, যেহেতু ওই ব্যক্তির স্ত্রীকে আল্লাহর রাসুল ﷺ স্বামীর সেবার অনুমতি দিয়েছেন সুতরাং তুমিও গিয়ে অনুমতি চাও। কিন্তু আমি তখন যুবক। নিজের কাছেই লজ্জাবোধ হলো, আমি কীভাবে গিয়ে রাসুলের কাছে স্ত্রীর সেবার অনুমতি চাইব! আমি আর যাইনি। তবে অন্তরে অনেক কষ্ট ছিল, অনেক যন্ত্রণা ছিল।

কাব রাযি. বলেন, ওই সময়গুলোতে যখন নামাজের জন্য যেতাম কেউ আমার সঙ্গে কথ বলত না। আমি এটা জানার চেষ্টা করতাম, আল্লাহর রাসুল ﷺ আমার প্রতি সন্তুষ্ট নাকি অসন্তুষ্ট! সুতরাং আমি আড় চোখে রাসুল ﷺ-এর দিকে তাকাতাম। আমি লক্ষ্য করলাম, যখনই আমি নবীজির দিকে তাকাই তিনি চোখ অন্য দিকে ফিরিয়ে নেন। কিন্তু আমি যখন অন্য দিকে দৃষ্টি দিতাম তখন তিনি আমাকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখতেন।

কাব রাযি. বলেন, সেই সময় আমার ওপর আরেকটি পরীক্ষা এলো। পরীক্ষাটি হলো পাশের দেশের এক খ্রিস্টান বাদশা ব্যবসায়িক কাজে মদিনায় আসা-যাওয়া করতেন। এক ব্যক্তি ব্যবসায়িক পণ্য নিয়ে মদিনায় এলেন। তিনি একজনকে জিজ্ঞেস করলেন, কাব ইবনে আশরাফ কোথায় আছেন, একটু বলবেন কি! তিনি আমাকে দেখিয়ে দিলেন। ওই ব্যক্তি আমার কাছে এলেন এবং একটি চিঠি দিয়ে বললেন, আমাদের বাদশা আপনার কাছে এই চিঠি পাঠিয়েছেন। আমি চিঠিটি বের করে পড়লাম। সেই চিঠিতে বাদশা লিখলেন, আমি শুনেছি আপনার মনিব (নবী) আপনার সঙ্গে কঠোর আচরণ করছেন। আল্লাহ আপনাকে অপদস্থ হওয়ার জন্য সৃষ্টি করেননি। আপনি আমাদের কাছে চলে আসুন, আমরা আপনাকে যথাযথ মূল্যায়ন করবো। অর্থাৎ তিনি ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন।

কাব রাযি. বলেন, এই চিঠিটি পড়ে আমার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। ভাবতে লাগলাম, আমি এই পর্যায়ে পৌঁছে গেছি যে, কাফেরেরা পর্যন্ত আমাকে প্রলোভনের টোপ দিচ্ছে! তারা পর্যন্ত লোভ দেখিয়ে আমাকে টেনে নিতে চাচ্ছে! আমি রাগে-ক্ষোভে ওই চিঠিটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে চুলার ভেতর ফেলে দিলাম।

তিনি বলেন, আমি আল্লাহর দিকে মনোনিবেশ করে বারবার বলতাম, হে আল্লাহ! তোমার জন্য আমি সত্য বলেছি। অবশেষে ৫০তম দিনে নবী করিম

ﷺ ফজরের নামাজের পর সুসংবাদ শুনিয়ে দিলেন। বললেন, আল্লাহ তায়ালা এই তিন বান্দার গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। কাব রাযি. বলেন, এক সাহাবি পাশের 'সালাআ' পাহাড়ে চড়ে জোরে ঘোষণা করলেন, হে কাব! তোমাদের তওবা আল্লাহ্ কবুল করে নিয়েছেন। আমি তখন আল্লাহ্র শোকর আদায় করলাম। আরেকজন সাহাবি ঘোড়ায় চরে দ্রুত আমার কাছে এলেন। তিনিও আমাকে সুসংবাদ দিলেন যে, আল্লাহ্ আপনার গোনাহ্ ক্ষমা করে দিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার কাছে তখন দুটি কাপড়ই ছিল। তবুও যিনি সুসংবাদ নিয়ে এলেন তাকে একটি কাপড় দিয়ে দিলাম।

তিনি বলেন, এরপর আমি গেলাম নবী করিম ﷺ-এর দরবারে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। রাস্তায় যাদের সঙ্গেই দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে তারা সালাম দিয়েছেন এবং মোবারকবাদ জানিয়েছেন। আমি যখন মসজিদে নববিতে এলাম তখন তখন এক সাহাবি এগিয়ে এসে আমার সঙ্গে কোলাকুলি করলেন এবং আমাকে খুশিতে জড়িয়ে ধরলেন। তার এই উঠে আসা এবং মোবারকবাদ জানানোর কথা আমি জীবনে কোনোদিন ভুলবো না। বিপদাপদের সময় যারা পাশে দাঁড়ায় তাদের কথা মানুষ জীবনে কোনোদিন ভুলতে পারে না। তাদের কথা অন্তরে স্থান করে নেয়।

কাব রাযি. বলেন, আমি নবী করিম ﷺ-এর দরবারে হাজির হলাম। রাসুল ﷺ যখন খুশি হতেন তখন তাঁর চেহারায় এমন নূরের আভা ছড়িয়ে পড়ত মনে হতে পূর্ণিমার চাঁদের আলো চমকাচ্ছে। আমি নবীজিকে দেখলাম বেশ আনন্দিত; তাঁর চোখে-মুখে আনন্দের ছোঁয়া। তিনি বলেন, আমি রাসুল ﷺকে তখন বললাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার কাছে এখন এই পরিমাণ সম্পদ আছে। আপনি অনুমতি দিলে সব সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে দিতে চাই। নবী করিম ﷺ বললেন, কিছু নিজের জন্যও রেখে দাও। সুতরাং আমি খায়বারের ভূমিটুকু নিজের জন্য রেখে বাকি সম্পদ আল্লাহ্র রাস্তায় দান করে দিলাম।

আমি আরও আরজ করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার এই মুক্তি মিলেছে সত্যবাদিতার কারণে। এটাও আমার তওবার অংশ, আমি অঙ্গীকার করছি যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন সত্য বলব। আল্লাহ্র কসম, যেদিন রাসুল ﷺ-এর সামনে এই কসম করেছি সেদিন থেকে আমি কোনো মিথ্যা বলিনি।

আশা রাখি, বাকি জীবনও আমি এর ওপর অটল থাকতে পারব। আমাদের ব্যাপারে এই আয়াত নাজিল হলো-

لَقَدْ تَّابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَ الْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ؕ اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ۝ وَّ عَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا ؕ حَتّٰۤى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَ ضَاقَتْ عَلَيْهِمْ اَنْفُسُهُمْ وَ ظَنُّوْۤا اَنْ لَّا مَلْجَاَ مِنَ اللّٰهِ اِلَّاۤ اِلَيْهِ ؕ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوْبُوْا ؕ اِنَّ اللّٰهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۝ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ كُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ ۝

আল্লাহ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল,য খন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়াপরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। আর অপর তিনজনকে যাদেরকে পেছনে রাখা হয়েছিল, যখন পৃথিবী বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সঙ্কুচিত হয়ে গেল এবং তাদের জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠলো, আর তারা বুঝতে পারলো যে, আল্লাহ ব্যতীত আর কোনো আশ্রয়স্থল নেই, অতঃপর তিনি সদয় হলেন তাদের প্রতি যাতে তারা ফিরে আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দয়াময় করুণাশীল। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। *[সুরা তওবা, আয়াত: ১১৭-১১৯]*

আল্লাহর শপথ করে বলছি, ইসলাম গ্রহণের পর থেকে যত ধরনের পুরস্কার আমি লাভ করেছি এর মধ্যে সবচেয়ে বড় পুরস্কার হলো আমি আল্লাহর রাসুলের সামনে সত্য বলেছি। আমি তখন মিথ্যা বললে ধ্বংস হয়ে যেতাম তাদের মতো যারা মিথ্যা বলার কারণে ধ্বংস হয়েছে। কারণ আল্লাহ ওহি নাজিলের সময় যেভাবে মিথ্যাবাদীদের নিন্দা ও ভর্ৎসনা করেছেন তা আর কাউকে করেননি। আল্লাহ তায়ালা এ ব্যাপারে বলেন-

يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ۚ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ۝ اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّ نِفَاقًا وَّ اَجْدَرُ اَلَّا يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَاۤ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ۝

এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহর কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর-নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসেবে তাদের ঠিকানা হলো দোজখ। তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাজি হয়ে যাও। অতএব, তুমি যদি রাজি হয়ে যাও তাদের প্রতি তবুও আল্লাহ তায়ালা রাজি হবেন না এই নাফরমান লোকদের প্রতি। *[সুরা তওবা, আয়াত: ৯৬-৯৬]*

আমাদের তিনজনের বিষয়টি ওই লোকদের থেকে আলাদা করা হয় যাদের মিথ্যা সাক্ষ্য রাসুল ﷺ কবুল করে নিয়েছিলেন। নবীজি তাদের বায়াত করেন এবং তাদের মাগফেরাতের জন্য দোয়াও করেন। আর আমাদের বিষয়টি রাসুল ﷺ পরের জন্য রেখে দেন। এর মধ্যেই আল্লাহ আয়াত নাজিল করে ফায়সালা করে দেন।

মৃত্যু থেকে কয়েক সেকেন্ড দূরে

দুনিয়াতে তিন ধরনের লোক রয়েছে। কিছু লোক শুধু বিপদের মুহূর্তে আল্লাহকে স্মরণ করে। কিছু লোক আল্লাহকে স্মরণ করে এবং তার আনুগত্য প্রদর্শন করে। তবে বিপদ শেষ হয়ে গেলে আবার আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। আর কিছু লোক আছে যাদের রাত-দিনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর প্রতি আনুগত্য ও বিনম্রতায় কাটে।

এই তৃতীয় ধরনের লোকদের মধ্যে হজরত ইউনুস আ.ও রয়েছেন। তিনি তাঁর জাতিকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করলেন, দীনের দাওয়াত দিলেন। কিন্তু লোকেরা সত্য দীন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলো। ইউনুস আ. যখন দেখলেন তারা আর সুপথে আসবে না, দিন দিন তাদের অবাধ্যতা বেড়েই চলছে, তখন তিনি রাগ করে তাদের ছেড়ে চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন।

তিনি নিজের এলাকা থেকে বেরিয়ে সমুদ্রপাড়ে চলে গেলেন। একটি নৌকায় চড়ে বসলেন। নৌকাটি যখন সমুদ্রের মাঝখানে পৌঁছল তখন শুরু হলো তুফান। আশঙ্কা দেখা দিলো নৌকাটি ডুবে যাবে। নৌকার আরোহীরা সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলে সবাইকে বাঁচাতে হলে কাউকে বিসর্জন দিতে হবে। কিন্তু কে নিজেকে বিসর্জন দেবে! সিদ্ধান্ত হলো লটারি দেয়া হবে। যার নাম লটারিতে উঠবে তাকেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হবে। লটারিতে উঠে এলো হজরত ইউনুস আ.-এর নাম। কিন্তু যাত্রীরা কেউই তাঁর মতো একজন বুজুর্গ মানুষকে সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে চাইল না। আবার লটারি দেয়া হলো। বারবার লটারিতে উঠে এলো তার নাম। এবার তিনি নিজেই সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন।

সমুদ্রে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি বড় মাছ তাকে গিলে ফেলল। তিনি চলে গেলেন মাছের পেটে। সেখানে তিনি অনুভব করলেন গভীর সমুদ্রের পাথরগুলো পর্যন্ত আল্লাহকে স্মরণ করছে। তখন তাঁর মনে নিজ এলাকা ছেড়ে চলে আসার কষ্ট থেকে থেকে অনুভব হতে লাগল। তিনি আল্লাহর দরবারে বিনম্রভাবে আকুতি জানালেন-

فَنَادٰى فِى الظُّلُمٰتِ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّآ اَنْتَ سُبْحٰنَكَ ۖ اِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝

'অতঃপর তিনি অন্ধকারের মধ্যে আহ্বান করলেনঃ তুমি ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তুমি নির্দোষ আমি গোনাহগার।' *[সুরা আম্বিয়া, আয়াত ৮৭]*

ইউনুস আ.-এর এই কথাগুলো সরাসরি আরশে চলে গেল। আল্লাহ তাঁর বান্দার ডাক শুনলেন এবং তাঁকে বিপদ থেকে উদ্ধার করলেন। এটা হলো ইউনুস আ.-এর ঘটনা। কিন্তু আজকের ইউনুস কী বলছেন? শুনুন-

আমি যৌবনের উন্মাদনায় বিভোর ছিলাম। সম্পদ জমানো, দামি আবাসস্থল, দ্রুতগামী বাহন আর আলিশান বাংলোকেই জীবন মনে করতাম। দিনটি ছিল শুক্রবার। আমি সমুদ্র তীরে বন্ধুদের সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিলাম এবং নির্মল হাওয়া খাচ্ছিলাম। আমরা সবাই আল্লাহর প্রতি গাফেল ছিলাম। পার্থিব চাকচিক্য আর রঙ-ঢংই ছিল আমাদের পরম কাঙ্ক্ষিত। সমুদ্রের নির্মল হাওয়া যখন শরীর ও মন জুড়িয়ে দিচ্ছিল তখন মসজিদ থেকে আওয়াজ ভেসে এলো- 'হাইয়্যা আলাস সালাহ হাইয়্যা আলাস সালাহ', 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ হাইয়্যা আলাল ফালাহ'। 'নামাজের দিকে এসো, কল্যাণের দিকে এসো।'

জীবনে অসংখ্যবার এই আজান শুনেছি, কিন্তু একটিবারের জন্যও 'কল্যাণের পথে' গমন করিনি। আমার হৃদয়রাজ্য জুড়ে ছিল শয়তানের কর্তৃত্ব। আমি আজান এক কান দিয়ে শুনতাম আরেক কান দিয়ে বের করে দিতাম। সমুদ্রের পাড়ে ঘুরতে আসা লোকেরা নামাজের জন্য নিজের জায়নামাজ বিছালো এবং নামাজের জন্য একত্রিত হতে থাকল। আমরা অক্সিজেনসহ সমুদ্রে ডুব দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলাম।

আমরা সমুদ্রে নামার পোশাক পরে নিলাম এবং সমুদ্রে নেমে পড়লাম। তীর থেকে দূরে সরে যেতে লাগলাম। এভাবে সমুদ্রের গভীরে পৌঁছে গেলাম। এই সময় হঠাৎ মুখে লাগানো মুখোশটি ফুটো হয়ে গেল। এটি ফুটো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্রের লবণাক্ত পানি মুখের ভেতর ঢুকে গেল। আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। মৃত্যু খুব কাছে অনুভূত হতে লাগল। আমার বন্ধু অনেকটা দূরে চলে গেছে। আমি নিজের অসহায়ত্ব কাউকে বলতেও পারছি না। মনে হচ্ছে কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ব।

বাঁচার জন্য সমুদ্রে ডোবাতে থাকলাম। কিন্তু প্রথম ডুবেই বুঝতে পারলাম আমি কতটা দুর্বলপ্রকৃতির। আল্লাহ আমার মুখে লবণাক্ত পানির কয়েকটি ফোঁটা ঢুকিয়ে দিয়ে পরিষ্কার করে দিলেন গোটা শক্তির মালিক একমাত্র তিনি। আমার বিশ্বাস হয়ে গেল আল্লাহ ছাড়া আর কোনো আশ্রয়দাতা নেই।

আমি দ্রুত সাঁতার কেটে তীরে আসার প্রাণপণ চেষ্টা করছিলাম। কিন্তু আমি চলে গিয়েছিলাম অনেক দূরে। মৃত্যুর মুখোমুখি হওয়ার পরেও আমি মৃত্যুকে ভয় পাচ্ছিলাম না। আমার শুধু ভয় হচ্ছিল এই অবস্থায় মরে গেলে আমি স্রষ্টার সামনে গিয়ে কীভাবে মুখ দেখাব? আল্লাহ যদি প্রশ্ন করেন তুমি জীবন কীভাবে কাটিয়েছ এর কী জবাব দেব! আমি তো সারাক্ষণ কাটিয়েছি গাফিলতির মধ্যে। জীবন ব্যয় করেছি আল্লাহর অবাধ্যতায়। আল্লাহর নির্দেশ নামাজের ধারেকাছেও কোনোদিন যাইনি।

এই বিপদসঙ্কুল অবস্থায় হঠাৎ আমার কালেমায়ে শাহাদতের কথা মনে পড়ল। আমি কালেমা পড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু গলার ভেতরে পানি ঢুকে যাচ্ছে। মনে হচ্ছিল আমি যেন কালেমা পড়তে না পারি এজন্য কেউ গলায় টুটি চেপে ধরেছে। মনে মনে বলছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও আমাকে যেন একটু শুকনোতে নিয়ে যায়। আমি যেন শেষবারের মতো মুখে আল্লাহর একত্ববাদের সাক্ষ্য দিতে পারি। বাহ্যত বাঁচার কোনো উপায় চোখে ভাসেনি। বিপদের ঘনঘটা আমাকে নিরাশ করে দেয়।

এরমধ্যেই যেন আল্লাহর রহমতের ছোঁয়া সরাসরি আমাকে স্পর্শ করে। আমি আমার সিনায় একটু একটু হাওয়া ঢুকছে বলে অনুভব করলাম। দেখলাম আমার সাথী আমার মুখে অক্সিজেন লাগিয়ে আমার হুঁশ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে। তার চেহারায় আনন্দের ঝিলিক দেখে বুঝতে পারলাম আমি এখন ভালো আছি। এ সময় আমার প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ যেন এই সাক্ষ্য দিচ্ছিল আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, মুহাম্মদ ﷺ আল্লাহর নবী ও রাসুল। আলহামদুলিল্লাহ।

আমি যখন এই কঠিন বিপদ থেকে রক্ষা পেলাম তখন আমি আর আগের সেই ইউনুস ছিলাম না। আমার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন চলে এসেছিল। আমি প্রতিদিনই যেন আল্লাহর নিকটতম হতে লাগলাম। আমি যেন আমার জীবনের লক্ষ্যের সন্ধান পেলাম। আল্লাহর এই নির্দেশ আমার বোধগম্য হলো- 'আমি জিন ও মানুষকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র আমার ইবাদতের জন্য।'

কয়েক দিন পর সেই ঘটনা আমার খুব মনে পড়ল। আমি আবার সেই সমুদ্রের তীরে গেলাম। লাইফ পোশাক পরে নেমে গেলাম সমুদ্রে। চলে গেলাম ঠিক সেই জায়গায় যেখানে আমি ডুবতে বসেছিলাম। এবার আমার মধ্যে কোনো আতঙ্ক নেই। সম্পূর্ণ আল্লাহর জন্য নিজেকে সোপর্দ করে দিলাম। তাঁর কৃতজ্ঞতায় সেজদায় অবনত হলাম। এমন গভীরভাবে তাকে সেজদা করলাম যা জীবনে কোনোদিন করিনি। এমন এক জায়গায় আমি সেজদায় আল্লাহকে স্মরণ করছি যেখানে আর কেউ কোনোদিন সেজদা করেনি। আমার বিশ্বাস, আল্লাহ আমাকে কেয়ামতের দিন এই সেজদার উসিলায় ক্ষমা করে দেবেন। আল্লাহ আমার মনের এই আকুতি পূরণ করুন।

জীবনের সুসংবাদ

আমাদের প্রভু আমাদের ওপর মা-বাবার চেয়েও বেশি দয়াবান। আর এই দয়ার কারণেই তিনি অপরাধী, পাপাচার, কাফের, মুশরিক সবার জন্য তওবার দরজা খোলা রেখেছেন। তার রহমতের ধারা প্রত্যেকের ওপর বর্ষিত হয়। প্রত্যেকের জন্য সবসময় তওবার সুযোগ রয়েছে।

ওই বৃদ্ধের দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। অশীতিপর বৃদ্ধ। কাঁপতে কাঁপতে নবী করিম ﷺ-এর দরবারে এলেন। আল্লাহর রাসুল ﷺ তখন সাহাবায়ে কেরামকে নিয়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। বৃদ্ধ এসে রাসুলের পাশে দাঁড়ালেন। বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এক ব্যক্তি পুরো জীবন কাটিয়েছে আল্লাহর অবাধ্যতায়। এমন কোনো গোনাহ নেই যা সে করেনি। তার গোনাহগুলো ভাগ করে দিলে দুনিয়ার সব মানুষ শাস্তির মুখে পড়ার মতো। মৃত্যুর আগে এমন ব্যক্তির তওবাও কি আল্লাহ কবুল করবেন?

রাসুল ﷺ মাথা উঁচু করে বৃদ্ধের দিকে তাকালেন। দেখলেন বৃদ্ধ কাঁপছে, দাঁড়িয়ে থাকতে কষ্ট হচ্ছে। তার অবয়ব দেখেই বোঝা গেল সারা জীবন আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত থেকে জীবন-যৌবন সব তিলে তিলে ক্ষয় করেছে। আল্লাহর রাসুল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম গ্রহণ করেছ কি?

বৃদ্ধ সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, 'আশহাদু আল্লা- ইলা-হা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ।

রাসুল ﷺ বললেন, যাও, নেক কাজ কর আর গোনাহ ছেড়ে দাও। আল্লাহ তোমার গোনাহের কাজগুলো সওয়াবে রূপান্তর করে দেবেন।

বৃদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, আমার জীবনের কালো অধ্যায়গুলো কি ক্ষমা করে দেয়া হবে?

রাসুল ﷺ বললেন, হ্যাঁ।

বৃদ্ধ খুশিতে আত্মহারা হয়ে 'আল্লাহু আকবার' 'আল্লাহু আকবার' বলতে বলতে চলে গেলেন। সাহাবায়ে কেরাম তার দিকে তাকিয়ে থাকলেন। দেখতে দেখতে বৃদ্ধ লোকটি হারিয়ে গেলেন দৃষ্টি আড়ালে। *[আল মুজামুল কাবির লিত তাবারি, খণ্ড ৭, পৃষ্ঠা ৩১৪]*

মায়ের চেয়েও অনেক দয়ালু যিনি

আমিরুল মুমিনিন ওমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. বর্ণনা করেন। এক যুদ্ধে রাসুল ﷺ-এর কাছে কয়েকজন বন্দীকে আনা হলো। এর মধ্যে একজন নারীও ছিল। তার অবস্থা ছিল খুবই বিচিত্র। বন্দীদের মধ্যে কোনো শিশুকে পেলেই কোলে নিয়ে নিতো এবং তাকে চুমু দিতো, দুধ খাওয়াতো।

রাসুল ﷺ নারীর এসব আচরণ লক্ষ্য করলেন। সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের কি ধারণা এই নারী তার নিজের সন্তানকে কখনও আগুনে ফেলে দিতে পারে?

সাহাবায়ে কেরাম বললেন, তা কখনও সম্ভব নয়।

রাসুল ﷺ বললেন, মনে রাখবে, এই মহিলা নিজের সন্তানের ওপর যতটা দয়া দেখাচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা এর চেয়ে অনেক বেশি দয়ালু তার বান্দাদের ওপর। *[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৯৯৯]*

কী বিচিত্র অসুস্থতা!

এই ঘটনার বর্ণনাকারী ডা. মুহাম্মদ বিন আবদুর রহমান আল আরেফি। তিনি বলেন, হাসপাতালে আমি এক রোগীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। তার বয়স চল্লিশ ছুঁইছুঁই। দেখতে সুদর্শন। বাহ্যত তাকে দেখে অসুস্থ বলে মনে হয় না। কিন্তু তার সারা শরীর অবশ। শরীরের কোনো অনুভূতি নেই। শুধু মাথা আর ঘাড় কোনোরকম নড়াচড়া করতে পারে। তার শরীরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করলেও কোনো অনুভূতি হয় না। এমনকি প্রস্রাব-পায়খানার বেগও তিনি অনুভব করেন না। যখন দুর্গন্ধ আসে তখন তাকে শুশ্রুষাকারীরা কাপড় পাল্টে দেন।

আমি যখন তার পাশে গেলাম দেখলাম টেলিফোন বাজছে। তিনি আমাকে অনুরোধ করলেন টেলিফোনের রিসিভারটা যেন উঠিয়ে দিই। আমি রিসিভার উঠিয়ে কানে লাগিয়ে দিলাম। তিনি কথা বললেন, আমি দাঁড়িয়ে রইলাম। পরে অনুরোধ করলেন রিসিভারটা যেন রেখে দেই। আমি রিসিভার রেখে তাকে প্রশ্ন করলাম, আপনি কত বছর ধরে এই রোগে ভুগছেন? তিনি বললেন, ২০ বছর ধরে।

ডা. আরেফি আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। এটা তার বন্ধুর দেখা ঘটনা। তিনি বলেন, আমার বন্ধু এক রোগীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এ সময় ওই রোগী বিকট আওয়াজ করছিল। এত বিকট আওয়াজ যে শুনলে অন্তরাত্মা কেঁপে উঠে।

আমার বন্ধু বলেন, আমি তার কাছে গেলাম। দেখলাম এই রোগী প্যারালাইসিসে আক্রান্ত। এদিক-ওদিক দেখার চেষ্টা করেও দেখতে পারছে না। জিজ্ঞেস করলাম, এই রোগী এভাবে চিৎকার করছে কেন? আশেপাশের লোকের বলল, তার সারা শরীর প্যারালাইসিসে অচল। তার পেটেও সমস্যা। যা খায় তা সেভাবেই থাকে, হজম হয় না।

আমি তাদেরকে পরামর্শ দিলাম, ভারী খাবার একদম খেতে দেবেন না। রাইস ও মাংস জাতীয় খাবার সম্পূর্ণ এড়িয়ে চলবেন।

নার্সরা বললেন, তাকে শুধু দুধ পান করানো হয়। তাও আবার মুখ দিয়ে না, নাক দিয়ে নল দ্বারা ঢুকিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু এটাও হজম হয় না।

ডা. আরেফি বলেন, আমাকে আরেক বন্ধু বলেছেন, তিনিও এক রোগীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। এই রোগীও নড়াচড়া করতে পারতো না। কষ্টে চিৎকার করছিল। আমি তার কাছে গেলাম। দেখলাম পাশেই কুরআন শরিফ রেহালে খোলা অবস্থায় রয়েছে। আমি সে দিকে ভালোভাবে তাকিয়ে দেখলাম। তিনি সামনে থাকা দুটি পৃষ্ঠা পড়ার পর আবার সেই দুই পৃষ্ঠাই পড়তেন, এটা উল্টানোর মতো সামর্থ্যও ছিল না। তার পাশেও কোনো মানুষ ছিল না যে তাকে সহযোগিতা করবে।

আমি যখন তার পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম তখন আমাকে অনুরোধ কলেন, দয়া করে আমার কুরআন শরিফের পাতাটি একটু উল্টিয়ে দিন। আমি পাতা উল্টিয়ে দিলাম। তার চেহারায় খুশির ঝিলিক ফুটে উঠল। তিনি পড়তে শুরু করলেন। আমার কান্না চলে এলো। সারা শরীর অবশ তবুও কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি কী ঝোঁক। অথচ আমরা যারা সম্পূর্ণ সুস্থ-সবল কুরআন তেলাওয়াতের প্রতি আমাদের কী উদাসীনতা! ভুলেও কুরআন হাতে নিয়ে দেখি না।

ডা. আরেফির তৃতীয় বন্ধু আবদুল্লাহ একটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি কোনো এক হাসপাতালে একজনের কাছে গেলেন। তার সারা শরীরও প্যারালাইসিসে অচল ছিল। তিনি শুধু মাথা নড়াচড়া করতে পারতেন। তাকে দেখে খুব মায়া হলো। তিনি ওই রোগীকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার কী মনে চায়?

আবদুল্লাহ বলেন, আমার ধারণা ছিল তিনি বললেন, আমি যেন সুস্থ হয়ে যাই, স্ত্রী-সন্তানের সঙ্গে যেন সুখে দিন কাটাতে পারি। কিন্তু ওই রোগী জবাব দিলেন আমার বয়স প্রায় ৪০ বছর। আমার পাঁচটি সন্তান আছে। সাত বছর ধরে বিছানায় পড়ে আছি। আল্লাহর শপথ এই দীর্ঘ সময়ে একবারের জন্যও এই আকাঙ্ক্ষা মনে জাগেনি যে, আমি সন্তানদের দেখবো, তাদের সঙ্গে আনন্দঘন সময় কাটাবো। আগে জীবন যেমন ছিল সেভাবে যেন কাটাতে পারি এমন প্রত্যাশা কখনও জাগেনি।

আবদুল্লাহ বলেন, আমি খুবই বিস্মিত হলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আপনার আকাঙ্ক্ষা কী? তিনি বললেন, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো আমি

যেন কপালটি মাটিতে লাগাতে পারি এবং মহান স্রষ্টার জন্য সেজদা করতে পারি। কেঁদে কেঁদে যেন মালিককে আমার কষ্টের কথাগুলো শোনাতে পারি।

ডা. আরেফি এক চিকিৎসকের ব্যক্তিগত কাহিনি শুনিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি এক রোগীর কাছে গেলাম। সেখানে এক বৃদ্ধ লোক চৌকিতে শুইয়ে আছে। সুন্দর চেহারা, যেন নুর টপকে পড়ছে। তার হার্টের অপারেশন হয়েছিল। এর সঙ্গে ব্লাড প্রেসার কমে এসেছিল। মস্তিষ্কের সব কোষ পর্যন্ত রক্ত কণিকা পৌঁছতে পারছিল না। এখন রোগী সম্পূর্ণ কোমায়। তাকে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস দেয়া হচ্ছে। রোগী এক মিনিটে নয়বার শ্বাস নিচ্ছে।

রোগীর এক পাশে একজন বসা ছিল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই রোগীর পরিচয় কী? তিনি বললেন, রোগী আমার বাবা। আমি বললাম, তার চেহারায় নুর টপকে পড়ছে, বাস্তবেই তিনি একজন বুজুর্গ মানুষ। তখন ছেলে বলল, আমার বাবা দীর্ঘদিন ধরে একটি মসজিদে মুয়াজ্জিনের দায়িত্ব পালন করছেন।

আমি রোগীর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। হঠাৎ লক্ষ্য করলাম তার হাত নড়াচড়া করছে। বিস্ময়করভাবে চোখও খুললো। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চাইলাম, কিন্তু সফল হলাম না। ছেলে গিয়ে কানের কাছে কথা বলল, কিন্তু বোঝাতে সক্ষম হলো না।

ছেলে গিয়ে তার বাবার কানে কানে বলল, আব্বাজান! আমার মা ও ভাইবোনেরা সবাই ভালো আছে। মামাও সফর থেকে ফিরে এসেছেন। কিন্তু রোগী তাতে তেমন কোনো সাড়া দিচ্ছিল না। পরে ছেলে তার বাবাকে উদ্দেশ্য করে বললো, আব্বাজান! মসজিদ আপনার অপেক্ষায়। আপনার অবর্তমানে একজন আজান দিচ্ছেন, কিন্তু সেই আজানও অশুদ্ধ। মুসল্লিরা আপনাকে খোঁজে বেড়াচ্ছে। এই কথা শোনার পর রোগীর হার্টবিট বেড়ে গেল। অক্সিজেন মেশিনের দিকে লক্ষ্য করলাম মিনিটে ১৮ বার নিঃশ্বাস নিচ্ছেন। ছেলে তার বাবার কানে কানে গিয়ে চাচাত ভাইয়ের বিয়ের খবর দিলেন। কিন্তু তাতে কোনো সাড়া এলো না।

আমি এই অবস্থা দেখে রোগীর পাশে গেলাম। তার হাত নড়াচড়া করালাম। চোখ দুটি খুললাম। কিন্তু আশার কোনো ছিটেফোঁটাও দেখা গেল না। আমি খুবই নিরাশ হলাম। পরে আমার মুখ তার কানের কাছে নিয়ে বললাম, 'আল্লাহু আকবার, হাইয়্যা আলাস সালাহ, হাইয়্যা আলাল ফালাহ'।

অক্সিজেন মেশিনের দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা অনেক বেড়ে গেল।

সুবহানাল্লাহ! এটা কেমন অসুস্থতা! আল্লাহর শপথ, এটা রোগ নয়, রোগ হলো আমাদের। তার অন্তর সবসময় মসজিদের সঙ্গে লেগেছিল। তার অবস্থা হলো আল্লাহর এই বাণীর মতো-

رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ وَاِقَامِ الصَّلٰوةِ وَ اِيْتَآءِ الزَّكٰوةِ ۙ يَخَافُوْنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيْهِ الْقُلُوْبُ وَ الْاَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَهُمُ اللّٰهُ اَحْسَنَ مَا عَمِلُوْا وَ يَزِيْدَهُمْ مِّنْ فَضْلِهٖ ؕ وَ اللّٰهُ يَرْزُقُ مَنْ يَّشَآءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

'এমন লোকেরা, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামাজ কায়েম করা থেকে, জাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না। তারা ভয় করে সেই দিনকে, যেদিন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ উল্টে যাবে। (তারা আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করে) যাতে আল্লাহ তাদের উৎকৃষ্টতর কাজের প্রতিদান দেন এবং নিজ অনুগ্রহে আরও অধিক দেন। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুজি দান করেন। *[সুরা আন-নুর, আয়াত: ৩৭-৩৮]*

কিন্তু হে অসুস্থতা ও দুশ্চিন্তামুক্ত মানুষেরা! হে আরাম আয়েশে জীবনযাপনকারীরা! হে আল্লাহর প্রতি নির্ভয় মানুষেরা! আল্লাহ তোমার ওপর কী পরিমাণ অনুগ্রহ করেছেন সেটা কি একবার ভেবেছ? অথচ এর বিনিময়ে রাত-দিন আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত। তুমি কবে বুঝবে! এখনও সময় আছে সুপথে এসো। এখনও সুযোগ আছে। মহান স্রষ্টার দানের হাত কখনও দিতে বিরক্তবোধ করে না।

তোমার কি ভয় হয় না কাল হাশরে তোমাকে আল্লাহর সামনে দাঁড়াতে হবে। যাবতীয় নেয়ামতের হিসাব তোমাকে সেদিন দিতে হবে। বল, সেদিন তুমি কী জবাব দেবে?

আল্লাহ তোমাকে জিজ্ঞেস করবেন, হে প্রিয় বান্দা! আমি কি তোমাকে সুস্থতার নেয়ামত দান করিনি? আমি কি তোমাকে ভরপুর রিজিক দিইনি? তোমাকে কি সুস্থ-সবল কান দান করিনি? তুমি বলবে, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আপনি আমাকে এসব নেয়ামত দিয়েছিলেন।

তখন মহাশক্তিমান আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, এসব নেয়ামত পেয়েও কেন তুমি আমার অবাধ্যতা পোষণ করেছিলে? আমার আজাব ও পরিণতির কথা না ভেবে কেন সারাক্ষণ গোনাহে লিপ্ত ছিলে?

সেই সময় যাবতীয় পর্দা তুলে দেয়া হবে। সব রহস্য ফাঁস হয়ে যাবে। তোমার যাবতীয় অপরাধ সৃষ্টিকুলের সামনে প্রকাশ হয়ে যাবে। তোমার সামনে গোনাহের ফিরিস্তি হাজির করা হবে।

একটি ছোট্ট ভুলের কারণে আমাদের আদিপিতা আদম আ.কে জান্নাত থেকে বের করে দেয়া হয়েছিল। নুহ জাতির ধ্বংসের কারণ এই গোনাহ্। আদ ও সামুদ জাতি বিলীন হয়ে গেছে এই গোনাহের কারণে। গোনাহের কারণে লুত জাতির বসতিকে উল্টে দেয়া হয়েছে। কওমে শুয়াইবের ওপর গোনাহের কারণেই আজাব এসেছিল। এই গোনাহের কারণে ফেরআউন ও তার সম্প্রদায়ের উপর দুর্যোগ নেমে এসেছিল। গোনাহের কারণেই আবরাহার উপর পাথর বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। গোনাহই হলো সব অনিষ্টের মূল।

দৃঢ়তার পাহাড়

সৎচরিত্রের মানুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব সবসময়ই মঙ্গলের। রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণে আবু বকর রাযি. সর্বপ্রথম ইসলামের দাওয়াত কবুল করেছেন। রাসুল ﷺ-এর ওপর যখন ওহি নাজিল হলো তখন তিনি সর্বপ্রথম আবু বকর রাযি.-এর অন্তরে এ ব্যাপারে করাঘাত করেন। আর আবু বকর রাযি. তা গ্রহণ করে নেন। মহান ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধুত্বের কারণেই আল্লাহ তাকে বিরল এই মর্যাদায় ভূষিত করেছেন।

ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর রাযি.-এর হৃদয়ে তাবলিগে দীন এবং হকের পতাকা উঁচু করার প্রেরণা প্রবলভাবে জেগে উঠে। শুরুর দিকে রাসুল ﷺ মক্কায় চুপি চুপি দীনের দাওয়াত দিতেন। মুসলমানরাও তাদের ইসলাম গ্রহণের কথা গোপন করতো। যখন মুসলমানদের সংখ্যা ৩৮ হয়ে গেল তখন আবু বকর রাযি. প্রকাশ্যে ইসলামের ঘোষণা দিতে নবী করিম ﷺকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। রাসুল ﷺ বারবার বলতেন, আবু বকর! আমরা সংখ্যায় এখনও অনেক কম, একটু ধৈর্য ধর।

আবু বকর রাযি. তাঁর পীড়াপীড়ি অব্যাহত রাখলেন। এমনকি নবী করিম ﷺ মসজিদে হারামের উদ্দেশ্যে বের হলেন, সঙ্গে অন্য মুসলমানরাও চলল। মুসলমানরা সবাই সারা মসজিদে বিস্তৃত হয়ে গেল, প্রত্যেকে নিজ নিজ গোত্রের লোকদের পাশে গিয়ে বসল।

আবু বকর রাযি. দাঁড়িয়ে গেলেন এবং খুতবা দিতে লাগলেন। তিনি সরাসরি ইসলামের দিকে লোকদের আহ্বান করতে থাকলেন। মক্কার মুশরিকরা দেখল আবু বকর তাদের কথিত মাবুদকে অস্বীকার করে নতুন ধর্মের দাওয়াত দিচ্ছেন। তাই তারা আবু বকর রাযি. ও অন্য মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। তাদেরকে ব্যাপক মারধর করল। তবুও থেমে যাননি আবু বকর রাযি.। তিনি তাঁর দাওয়াত অব্যাহত রাখলেন।

একদিন মুশরিকদের একটি গ্রুপ তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ধরল এবং এই পরিমাণ মারধর করল যে, তিনি জ্ঞান হারালেন। তিনি তখন মধ্যবয়সী। উতবা বিন রবিয়া তাঁর কাছে এলো। তাঁকে মারধর করতে থাকল। চেহারায় এতো মারল যে রক্ত প্রবাহিত থাকল। চেহারা দেখে তাঁকে চেনা কঠিন হয়ে গেল। তিনি জ্ঞান হারালেন। এর মধ্যেই তাঁর সম্প্রদায় বনু তামিমের লোকজন একে একে আসতে থাকল।

তারা লোকজনের ভিড় ঠেলে তাঁকে উঠাল এবং একটি কাপড়ে পেঁচিয়ে নিলো। তারা তাঁর বেঁচে থাকার ব্যাপারে সন্দিহান হয়ে পড়ল। তাঁকে ঘরে নিয়ে আসা হলো। তাঁর বাবা ও পাড়া-প্রতিবেশীরা এসে বসলেন মাথার কাছে। তারা বিভিন্ন প্রশ্ন করছেন কিন্তু তিনি কোনো জবাব দিতে পারছিলেন না।

সন্ধ্যা যখন ঘনিয়ে আসছে তখন তিনি একটু সুস্থ বোধ করলেন। চোখ খুললেন। চোখ খুলেই প্রথমে জিজ্ঞেস করলেন- রাসুল ﷺ-এর কী হয়েছে? তাঁর সুস্থতার ব্যাপারে আমাকে অবগত কর। তাঁর বাবা রাগে নানা কথাবার্তা বললেন এবং সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। তাঁর মা মাথার পাশে বসে তাঁকে খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি বারবার একই কথা জানতে চাচ্ছিলেন রাসুল ﷺ কেমন আছেন? তিনি সুস্থ আছেন কি না এ ব্যাপারে আমাকে জানাও। তাঁর মা বললেন, আল্লাহর কসম! ব্যাপারে আমার কিছু জানা নেই।

আবু বকর রাযি. বললেন, আম্মাজান! একটু উম্মে জামিল বিনতে খাত্তাবের কাছে যান এবং তার কাছ থেকে রাসুলের অবস্থা সম্পর্কে জেনে আসুন। উম্মে জামিল আগেই ইসলাম গ্রহণ করেছেন কিন্তু বিষয়টি গোপন রেখেছেন। আবু বকর রাযি.-এর মা তাঁর কাছে এলেন এবং বললেন, আবু বকর আমাকে তোমার কাছে পাঠিয়েছে। সে জানতে চাচ্ছে মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহর কী অবস্থা!

উম্মে জামিল রাযি.-এর ভয় হলো, এই মহিলা আবার আমার ইসলাম গ্রহণের বিষয়টি ফলাও করে প্রচার করে দেন! এজন্য তিনি কৌশলের আশ্রয় নিলেন। বললেন, আমি মুহাম্মদকেও চিনি না, আবু বকরকেও চিনি না। তবে আপনি অনুমতি দিলে আপনার সঙ্গে আপনার ছেলের কাছে যেতে রাজি আছি। আবু বকর রাযি.-এর মা বললেন, কেন নয় অবশ্যই তুমি চল।

তারা দুজনই আবু বকর রাযি.-এর কাছে এলেন। উম্মে জামিল হজরত আবু বকর রাযি.-এর চেহারায় আঘাতের চিহ্ন দেখে কাঁদতে লাগলেন। বললেন কাফের মুশরিকরা ইসলাম গ্রহণের কারণেই তোমাকে এভাবে মারধর করেছে। আমার বিশ্বাস আল্লাহ তোমাকে উত্তম বদলা দেবেন।

আবু বকর রাযি. অস্থির হয়ে পড়লেন, বললেন, উম্মে জামিল! আমাকে দ্রুত বল রাসুল ﷺ কী অবস্থায় আছেন? উম্মে জামিল রাযি. হজরত আবু বকর রাযি.-এর মায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন। কারণ তিনি তখনও মুসলমান হননি। তিনি আবু বকর রাযি.-এর মাকে একটু ভয় পেলেন, তিনি যদি মুসলমানদের ভেতরের খবর কাফেরদের কাছে প্রচার করে দেন!

তিনি আবু বকর রাযি.কে বললেন, তোমার মা আমাদের কথাবার্তা শুনছেন।

আবু বকর রাযি. নির্ভয় দিয়ে বললেন, কোনো সমস্যা নেই, তুমি নির্বিঘ্নে বলতে পারো।

তখন উম্মে জামিল রাযি. বললেন, আল্লাহর রাসুল ﷺ সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং ইবনে আরকামের ঘরে আছেন।

আবু বকর রাযি. এর মা তাঁর ছেলেকে বললেন, এবার তো তুমি তোমার বন্ধুর খবর জেনেছ। এবার কিছু খাবার খাও। আবু বকর রাযি. বললেন, আল্লাহর শপথ! আমি ওই সময় পর্যন্ত কিছু খাবো না যতক্ষণ আল্লাহর রাসুলকে নিজ চোখে না দেখব।

রাত গভীর হলো। আবু বকর রাযি. দাঁড়ানোর চেষ্টা করলেন। কিন্তু রক্ত প্রবাহিত হওয়ার কারণে শরীর অনেক দুর্বল। উম্মে জামিল ও তাঁর মা কাঁধে ভর করিয়ে তাঁকে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে নিয়ে গেলেন। রাসুল ﷺ তাঁকে দেখে বুকে বুক লাগালেন এবং তাঁর কপালে চুমু খেলেন। তাঁর অবস্থা দেখে রাসুল ﷺ খুবই কষ্ট পেলেন এবং সাহাবায়ে কেরামও চিন্তিত হলেন।

আবু বকর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমার মা-বাবা আপনার ওপর উৎসর্গ হোক। আমার কোনো কষ্ট নেই, চেহারায় উতবা বিন রবিয়া যে আঘাত করেছে তাতে কিছুটা ব্যথা লাগছে।

এরপর আবু বকর রাযি. বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! তিনি আমার সম্মানিত মা। তিনি আমার প্রতি খুবই সদাচরণ করেন। তিনি অনেক ভালো। আপনি তার জন্য একটু দোয়া করে দিন। আশা করি আপনার দোয়ার বরকতে আল্লাহ তাকে জাহান্নামের আগুন থেকে তাকে রক্ষা করবেন। আল্লাহর রাসুল

ﷺ দোয়া করলেন। পরবর্তী সময়ে আবু বকর রাযি.-এর মা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন।

ধৈর্য ও সহনশীলতার পাহাড় আবু বকর রাযি.-এর দিকে একটু তাকিয়ে দেখুন। মুশরিকরা মারতে মারতে তাকে রক্তাক্ত করেছে, তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়েছেন তবুও তিনি নিজের কথা ভাবেননি। তাঁর সবচেয়ে বড় আক্ষেপ ছিল রাসুল ﷺ সুস্থ আছেন কি না।

দীনের জন্য এমন উৎসর্গিত প্রাণের সন্ধান কোথায় মিলবে? নিজের সারা শরীর রক্তাক্ত। দাঁড়ানোর সামর্থ্যটুকুও নেই। তবুও আল্লাহর দীনের তাবলিগ অব্যাহত রেখেছেন। নিজের মায়ের হেদায়াত চেয়ে আল্লাহর রাসুল ﷺকে দিয়ে দোয়া করিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত তাঁর মা ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছেন।

এবার আসুন আমরা আমাদের মনকে জিজ্ঞেস করি, ইসলামের জন্য আমরা কী করেছি? আমাদের দ্বারা কতজন হেদায়াত লাভ করেছে? আমরা কি আল্লাহর রাস্তায় কোনো দুঃখ-কষ্ট সহ্য করেছি! আমরা কি সৎ কাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধ পালন করছি! আমরা কি আল্লাহর বিধানগুলো রাসুল ﷺ-এর নির্দেশিত পদ্ধতিতে পালন করছি! আমরা কি আমাদের পরিবার ও সমাজের জন্য আদর্শ কিছু রেখে যেতে পারছি! আমরা কি আল্লাহর দীনের তাবলিগের জন্য কোনো পদক্ষেপ নিয়েছি! আল্লাহর কসম, প্রত্যেক মুসলমানের ওপর ফরজ হলো দীনে হানিফের তাবলিগ করা। লোকদেরকে আল্লাহর রাস্তায় ডাকা। তখন আল্লাহ সাহায্য করবেন এবং এর দ্বারা জীবনের সব পথ খুলে যাবে।

যুবকের সফলতা

সে ছিল অতি গরিব। পুরো যৌবনেও আল্লাহর ভয় তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিস্তৃত ছিল। সে সবসময় আল্লাহর জিকিরে নিমগ্ন থাকত। শয়তান তাকে সবসময় বিপদগামী করার চেষ্টা করত। কিন্তু আল্লাহর সাহায্য ছিল তার সঙ্গে। সে জীবিকা নির্বাহের জন্য অলিগলিতে মাল ফেরি করে বিক্রি করত। একবার সে এমন এক নারীর সামনে পড়ল, যার কাছে হালাল ও হারামের কোনো গুরুত্ব নেই। হারাম কাজে লিপ্ত হতে ওই মহিলা বিন্দু পরিমাণও কুণ্ঠিত হতো না।

যুবক ওই মহিলার ঘরের সামনে পণ্য নিয়ে এলো। মহিলা উঁকি দিয়ে তাকে দেখল। এরপর যুবককে ডেকে বলল, তোমার পণ্য নিয়ে একটু ঘরের ভেতর এসো, আমি একটু দেখব। যখন ফেরিওয়ালা যুবক ঘরে ঢুকল তখন মহিলা দরজা বন্ধ করে দিলো। যখন যুবককে গুনাহের কাজের দিকে আহ্বান করল, তখন যুবক নাউযুবিল্লাহ বলে দৌড়ে ঘর থেকে পালিয়ে এলো। সে এই গ্রামের রাস্তায়ও আর কোনোদিন আসেনি।

এই ফেরেশতাস্বভাবের যুবক কেয়ামত দিবসের আলোচনা করেছে। বলেছে এখানকার সব স্বাদ শেষ হয়ে যাবে, শুধু আফসোস বাকি থেকে যাবে। সেইদিন যেসব অঙ্গ দ্বারা মানুষ অপকর্ম করত, তা নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। পা বলবে, হে আল্লাহ! আমার ওপর ভর করে সে তোমার অবাধ্য কাজ করতে গিয়েছিল। হাত বলবে, হে আল্লাহ! তুমি যা হারাম করেছিলে তা আমার দ্বারা সে স্পর্শ করেছে। মুখ সাক্ষ্য দেবে, প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সাক্ষ্য দেবে।

এরপর সে জাহান্নামের আগুন এবং আল্লাহর ভয় প্রদর্শন করে বলে, কেয়ামতের দিন ব্যভিচারকারীদের জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। তাদের লোহা দিয়ে আঘাত করা হবে। ব্যভিচারকারী যখন কষ্টে চিৎকার করবে, তখন ফেরেশতারা জিজ্ঞেস করবে এটা কী ধরনের আওয়াজ! তোমরা তো

অনেক হাসি-ফূর্তি করতে। আল্লাহর আজাবের ভয় তোমাদের মধ্যে একদম ছিল না। তোমাদের একটুও লজ্জা হতো না।

ওই যুবক নবী করিম ﷺ -এর বাণী শোনালো-

> হে উম্মতে মুহাম্মদি! নিজের গোলাম ও বাঁদিকে ব্যভিচারে লিপ্ত দেখে অন্য কেউ আল্লাহর চেয়ে বেশি আত্মমর্যাদাবোধে আঘাতপ্রাপ্ত হন না। হে উম্মতে মুহাম্মদি! আমি যা জানি তা যদি তোমরা জানতে তবে তোমরা অনেক কম হাসতে এবং অনেক বেশি কাঁদতে। *[সহিহ বুখারি, আন-নিকাহ, হাদিস নং ৫২২১]*

এই যুবক ওই দিনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়,

> যেদিন নবী করিম ﷺ স্বপ্নে নারী-পুষদের দেখলেন, চুলার মতো সংকীর্ণ স্থানে তাদেরকে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় রাখা হয়েছে। চুলার উপরের অংশ সংকীর্ণ এবং নিচের অংশ খোলা। সেই চুলা দাউদাউ করে জ্বলছে। যখন নিচের দিকে আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলে উঠে তখন তারা কষ্টে চিৎকার করতে থাকে। নবী করিম ﷺ জিবরাইল আ.কে জিজ্ঞেস করলেন, তারা কে? জিবরাইল আ. জবাবে বললেন, তারা ব্যভিচারি নারী ও পুরুষ। *[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৭০৪৭]*

কেয়ামত পর্যন্ত তাদেরকে এই শাস্তি অব্যাহতভাবে দেয়া হবে। আখেরাতের আজাব খুবই ভয়াবহ। আল্লাহর কাছে তা থেকে আমাদের পরিত্রাণের দোয়া করা উচিত।

শয়তান ওই নারীর ওপর হামলা করে বসল। তাকে বলল, একটু জিনা করে নাও, পরে তওবা করে নিলেই হবে। যুবক বলল, আমি আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যে নারী আমার জন্য হালাল নয় আমি তার দিকে কীভাবে তাকিয়ে দেখব! আমি আমার প্রভুর সীমারেখা কীভাবে লঙ্ঘন করব? এটা কখনও সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ আমাকে দেখছেন। মাখলুক থেকে এই গোনাহ গোপন করা গেলেও খালেক থেকে কখনও গোপন করা সম্ভব নয়।

যুবক কিছুক্ষণ ভাবল এবং এখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার ফন্দি আঁটল। সে দরজার দিকে তাকাল। তখন মহিলা আরও পীড়াপীড়ি করতে লাগল। তাকে

ভয় দেখিয়ে বলল, তুমি যদি আমার মনোবাসনা পূরণ না কর আমি চিৎকার করে লোক জড়ো করব। আমি তাদেরকে বলব, সে আমার সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করছে। তখন তারা তোমাকে গণধোলাই দিয়ে জেলে পাঠাবে। পূত-পবিত্র এই যুবক আল্লাহর ভয়ে কাঁপতে লাগল।

তার বিশ্বাস হয়ে গেল এই মহিলা মনোবাসনা পূরণ করা ছাড়া নিজের টার্গেট থেকে ফিরে আসবে না। সে একটি কৌশলের কথা ভাবল এবং মহিলাকে বলল, আমি একটু পায়খানায় যেতে চাই। মহিলা তাকে পায়খানা দেখিয়ে দিলো। সে পায়খানায় গিয়ে ভাবতে লাগল কী করা যায়। তার মাথায় বুদ্ধি এলো। সে পায়খানার ময়লা গায়ে মেখে বেরিয়ে এলো। এবার আর ওই মহিলা তার কাছে ভিড়ল না। তাকে ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দিলো।

পুরো গায়ে ময়লা নিয়ে সে পথ দিয়ে যাচ্ছে। শিশুরা তাকে পাগল মনে করে পিছু নেয়। ঘরে ফিরে সে ময়লা পরিষ্কার করে গোসল করল। কিন্তু গোসলের পর তার শরীর থেকে সুগন্ধি আসতে থাকল। এই সুগন্ধি আসা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাকে এই পুরস্কারে ভূষিত করেন নিজের পবিত্রতা রক্ষা করার জন্য।

সত্যিকারের তওবা

এক যুবক সাহাবি। লোকেরা তাঁকে 'মায়েজ' নামে চিনত। তিনি বিয়ে করেছিলেন মদিনায়। একদিন তিনি এক বাঁদিকে দেখে আসক্ত হয়ে পড়েন। শয়তান ধোঁকার জাল বিস্তার করে। এতে তিনি ফেঁসে যান। যৌবনের তাড়নায় গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়েন।

যখন তিনি গুনাহের কাজটি সম্পন্ন করলেন, তখন শয়তান তার সঙ্গ ছেড়ে দিলো। এবার তিনি কান্নায় ভেঙে পড়লেন এবং নিজের প্রবৃত্তির হিসাব নিলেন। নিজেই নিজেকে ধিক্কার জানাতে থাকলেন। গুনাহের আগুন তার ভেতরে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকল।

তিনি অস্থির হয়ে উঠলেন। কোনোভাবেই স্থির থাকতে পারলেন না। এক পর্যায়ে ছুটে গেলেন আত্মার চিকিৎসক মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে। বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো ব্যভিচার করে বসেছি! আমাকে পবিত্র করে দিন। নবী করিম ﷺ তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তিনি ঘুরে অন্য দিকে এলেন। বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমি তো শয়তানের ফাঁদে পা দিয়ে ব্যভিচার করেছি। আপনি আমাকে পবিত্র করে দিন।

নবী করিম ﷺ বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তুমি চলে যাও এবং আল্লাহর কাছে গুনাহের জন্য ক্ষমা চেয়ে তওবা কর।

একটু পর তিনি আবার এলেন। গুনাহের আগুন তার আরাম ছিনিয়ে নিয়েছে। কোনোভাবেই তিনি ধৈর্য ধারণ করতে পারছেন না।

নবী করিম ﷺ তার ব্যাপারে নির্দেশ দিলেন, তাকে এখান থেকে বের করে দাও। তাকে বের করে দেয়া হলো। তিনি চতুর্থবার আবার এলেন। নবী করিম ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছে জিজ্ঞেস করলেন, সে কি পাগল! তারা বললেন, হে আল্লাহর রাসুল! আমরা তো তার মধ্যে এমন কোনো চিহ্ন দেখিনি। রাসুল ﷺ বললেন, সে হয়ত মদ পান করেছে যার কারণে তার

অনুভূতি লোপ পেয়েছে। এ সময় এক সাহাবি উঠে মায়েজের মুখে নাক লাগিয়ে দেখলেন। কিন্তু না এ ধরনের কিছু অনুভব হয়নি।

নবী করিম ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো জিনা কী? তিনি বললেন, হ্যা আমি এক নারীর সঙ্গে এমন কাজ করেছি যা হালাল উপায়ে মানুষ তাদের স্ত্রীর সঙ্গে করে থাকে।

রাসুল ﷺ তাকে জিজ্ঞেস করলেন, এই কথা বলার দ্বারা তোমার কী উদ্দেশ্য? তিনি বললেন, আমি চাই আপনি আমাকে পবিত্র করে দিন। নবী করিম ﷺ ভালোভাবে বিষয়টি পরীক্ষা করলেন। যেহেতু অপরাধ প্রমাণিত, তাই তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ হবে। তাকে প্রস্তর নিক্ষেপ করে হত্যার নির্দেশ দেয়া হলো। তার শাস্তি এভাবেই প্রয়োগ করা হলো।

তার জানাজা ও দাফন শেষে নবী করিম ﷺ ফিরে যাচ্ছিলেন। রাস্তায় দুই লোক পরস্পরে বলাবলি করছিলেন, দেখ তার এই গুনাহের ওপর আল্লাহ পর্দা ঢেলে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেই তা প্রকাশ করে দিয়েছেন। এতে তাকে কুকুরের মতো পাথর মারতে মারতে হত্যা করা হয়েছে।

নবী করিম ﷺ তাদের কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন। একটু সামনে একটি মৃত গাধা পড়ে ছিল। রোদের কারণে গাধাটি ফুলে-ফেঁপে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছিল। এই গাধাটি দেখে রাসুল ﷺ তার সঙ্গীদের বললেন, অমুক অমুক কই আছে তাদেরকে নিয়ে এসো। কথামতো তাদেরকে নিয়ে আসা হলো। রাসুল ﷺ তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, তোমরা দুজন এই গাধাটির গোশত খাও। তারা বিস্মিত হলেন। বললেন, আমরা এই মৃত গাধার গোশত খাব কেন! এটা কে খেতে পারবে!

রাসুল ﷺ বললেন, এই মাত্র তোমরা যে তোমাদের এক ভাইয়ের ইজ্জত-সম্মান পদদলিত করেছ এটা মৃত গাধার গোশত খাওয়ার চেয়েও মারাত্মক। মায়েজ সত্যিকারের তওবা করেছেন। তার এই তওবা উম্মতের মধ্যে বণ্টন করে দিলে সবার মুক্তির জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। ওই সত্তার কসম যার হাতে আমার জীবন, সে জান্নাতের নদীতে সাঁতার কাটছে।

সুসংবাদ হলো, মায়েজ ইবনে মালেক রাযি.-এর জন্য। তিনি যৌবনের ধোঁকার শিকার হন। তিনি নিজের এবং প্রভুর মধ্যে স্থাপিত পর্দাকে সরিয়ে দেন। গুনাহ তাকে স্বস্তিতে বসতে দেয়নি। যার কারণে তার তওবা সমস্ত উম্মতকে বণ্টন করে দিলেও সবার ক্ষমার জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে বলে হাদিসে উল্লেখ আছে।

পথ দেখালো যে বিদায়

অশ্রুবানে তিনি নিজের ঘটনা বর্ণনা করছিলেন। তার বৃদ্ধ মা তাকে খুবই ভালোবাসতেন। কিন্তু এর বিপরীতে তার আচরণ ছিল ভিন্ন। মা তাকে বললেন, বাবা! তুমি এখানে থেকেই পড়াশোনা কর। এখানে সবধরনের সুযোগ সুবিধা আছে। তবুও তুমি আমার চোখের আড়াল হয়ো না। তিনি কাঁপতে কাঁপতে আমার গায়ে হাত বুলিয়ে কথাগুলো বলছিলেন। আমি একপলক তার দিকে তাকিয়ে রইলাম। কিন্তু গুনাহের কারণে আমার অন্তর এতটাই শক্ত হয়ে গিয়েছিল যে, তার কান্না আমার অন্তরে সামান্যও স্পর্শ করেনি।

মায়ের কোনো আকুতিই আমার কাছে গুরুত্ব পেল না। শহরের রঙিন পরিবেশ আমাকে ডাকছে। সেই রঙিন ডাকে সাড়া দিয়ে শহরে চলছি পড়াশোনার জন্য। কথিত মুক্তচিন্তা আর প্রগতি আমাকে ডাকছিল। আমি এই ডাকে অন্ধ ছিলাম। প্রবৃত্তির তাড়না নিবারণের পথে হাঁটছিলাম। মা আমাকে বিদায় জানাতে রাস্তা পর্যন্ত এলেন। আমি চলতে চলতে বাঁক ঘুরে হারিয়ে গেলাম। কিন্তু মা দাঁড়িয়ে রইলেন ঠিক একই জায়গায়।

বেশ কয়েক দিন হয়ে গেল। আমি আর বাড়িতে যাইনি। আমার কানে শুধু বাঁজছে মায়ের কথা, বেটা! তোমাকে আমি আল্লাহর হেফাজতে দিচ্ছি। তোমার দিকে যেন কেউ আড় চোখে না তাকায়। এরপর আমার কানে বাঁজতে লাগল, বেটা! তোমার ফিরে আসতে এতো দেরি কেন হলো!

কিন্তু আমি ছিলাম রঙিন স্বপ্নে বিভোর। আড্ডা, আমোদ-ফুর্তি আমাকে গাফলতের দুনিয়ায় মগ্ন করে রেখেছিল। গুনাহের পর গুনাহে লিপ্ত হতাম। আমার গলার স্বর ছিল খুবই সুন্দর। আমার এই স্বর আমাকে ধোঁকায় ফেলে দিলো। আমার বন্ধুরা আমাকে গানবাদ্যের দিকে টেনে নিলো।

আমি গানবাদ্যে পুরো মনোযোগী হলাম আর শয়তান তাতে সঙ্গ দিলো। অবশেষে একদিন থিয়েটারে গান গাওয়ার দাওয়াত পেলাম। আমার কিছুটা ভয় ভয় লাগছিল। প্রকৃতিগতভাবে যে লজ্জাবোধ ছিল, তাতে কিছুটা

ইতস্ততবোধ করছিলাম। কী করব বুঝে উঠতে পারছিলাম না। আমার অন্তর আমাকে শাসিয়ে বলছে তুমি এই ময়দানের লোক না। তুমি একটি ভদ্র পরিবারের সন্তান। এটা তো নিকৃষ্ট কাজ। আমার অন্তর আমাকে ভর্ৎসনা করছিল। কিন্তু মনের ভেতর ঘাপটি মেরে থাকা কুপ্রবৃত্তি আমাকে তাড়া করছিল। সে আমাকে উদ্বুদ্ধ করছিল, এটা এক সুবর্ণ সুযোগ। হাতছাড়া করা যাবে না। এর দ্বারা তুমি সহজেই খ্যাতি পাবে। কিছু সময় ভেবে আমি এই অফার গ্রহণ করলাম।

আমি স্টেজে উঠলাম গান গাইতে। প্রথমে একটা সংকোচ কাজ করছিল নিজের ভেতর। কিন্তু একটি গান গাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা উধাও হয়ে গেল। আমার যাদুকরি স্বরে পুরো হল মাতোয়ারা হয়ে উঠল। চারদিক থেকে ধন্যবাদসূচক আওয়াজ ভেসে এলো।

আমার বন্ধুমহল বাড়তে লাগল। চারদিক থেকে দাওয়াত আসতে থাকল। এবার আমি প্রতি রাতে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় কনসার্ট করে বেড়াই। এমন কোনো গুনাহ নেই যাতে আমি লিপ্ত হইনি। একদিন অনেক বড় কোম্পানির পক্ষ থেকে আমাকে গান শোনানোর আমন্ত্রণ জানানো হলো। আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে আমি তা গ্রহণ করি। সেই গানের আসরের পর এই বিষয়ে দক্ষ একজন উস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। তিনি আমাকে এই অঙ্গনে আরও উন্নতি করার উৎসাহ ও পরামর্শ দেন। এ অঙ্গনে আরও ভালো করার জন্য আমাকে গাইড করবেন বলে আশ্বাস দেন। বৃহস্পতিবার তার সঙ্গে সাক্ষাতের দিন ধার্য হলো। সময় দ্রুত গড়াতে লাগল।

সেই ওয়াদার দুই দিন আগে আমি বাড়িতে ফিরে এলাম। বাড়িতে কিছু অনুষ্ঠান ছিল। বৃহস্পতিবার ছিল আমার বড় ভাইয়ের বিয়ে। আর বুধবার ছিল আমার দুই বোনের বিয়ের অনুষ্ঠান। আমার মা আনন্দে উদ্বেলিত। তিনি এতটাই আনন্দিত ছিলেন যে, মনে হচ্ছিল তা ভাগ করে দিলে সারা পৃথিবী আনন্দিত হয়ে উঠত।

বুধবার ছিল আমার দুই বোনের বিয়ে। কিন্তু সেদিন আমার ওপর এমন এক বিপদ পতিত হয়, যা আমাকে গাফলত থেকে জাগ্রত করে দেয়। সেই বিপদ আমার মৃত অন্তরকে জীবিত করে দেয়। সম্ভবত আমার ওপর বিপদের এই পাহাড় এ জন্য পতিত হয়, যাতে আমি অপদস্ততার রাস্তা থেকে মুক্তি লাভ করতে পারি।

আমার মা হঠাৎ মারা গেলেন। বিশ্বাস করতে কষ্ট হচ্ছিল আমার মা সবাইকে ছেড়ে এভাবে চলে যেতে পারেন। একটু আগেও তিনি আমাদের সঙ্গে আমোদ-ফুর্তি করছিলেন। আর এখন তিনি চিরদিনের জন্য নিদ্রায় চলে গেলেন। তার প্রাণহীন দেহ চৌকিতে পড়ে আছে। তিনি যেন সময়ের ভাষায় বলছিলেন, বিদায় আমার সন্তানেরা! তোমরা এখন বড় হয়ে গেছ। এখন আর আমার সহযোগিতার প্রয়োজন নেই।

সারা বাড়িতে নেমে এলো পিনপতন নীরবতা। একটু আগের আনন্দ-ফুর্তি পরিণত হলো শোকে। সবার চোখে অশ্রু। অন্তরে যা বইয়ে যাচ্ছে তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো নয়।

নারীরা তাকে শেষ গোসল দিলো। কাফন পরানো হলো। শেষবারের মতো তাকে দেখতে পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। চেহারায় আলো ঝলমল করছে। আমি আর নিজেকে স্থির রাখতে পারলাম না। কান্নায় ভেঙে পড়লাম। কেঁদে উঠল আমার ভাইবোনেরাও। চারদিকে কান্নার রোল পড়ে গেল। অনুষ্ঠিত হলো তার নামাজে জানাযা। তাকে আমরা নিজ হাতে কবরে শুইয়ে দিলাম। দাফন সম্পন্ন করার পর আল্লাহর দরবারে দোয়া করলাম। কেঁদে কেঁদে বললাম, হে আল্লাহ! মায়ের কোনো কথা শুনিনি। তার কোনো হকই আদায় করতে পারিনি। তুমি আমাকে ক্ষমা কর।

দাফন শেষে রাতে বাড়ি ফিরলাম। আত্মীয়-স্বজন অনেকেই চলে গেছে। আমি আমার কামরায় ঢুকে লাইট বন্ধ করে দিলাম। বিছানায় একটু শুইলাম। অতীত স্মৃতিগুলো আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে ভেসে উঠল। সেই স্মৃতিগুলো আমাকে কষ্ট দিলো। অতীতের একটি অংশ থেকে আওয়াজ এলো এবং পুরো কামরায় গুঞ্জরিত হলো-

হে আমার ছেলে! উঠো, নামাজে অলসতা করো না। ছেলে! উঠো, তোমার বন্ধু মসজিদে তোমার জন্য অপেক্ষায়। তুমি আমাকে ভুলে যেয়ো না। এখানে থেকেই পড়াশোনা কর।

আহ! আমি আমার কল্যাণকামী মায়ের সবগুলো কথা শুনছিলাম। এখন আফসোস করে কী লাভ, খাচার বাঘ যখন ছুটেই গেছে! অনুশোচনা আর আফসোস আমাকে কুরে কুরে খাচ্ছিল। দুশ্চিন্তার পাহাড় যেন আমার মাথায় আছড়ে পড়ল। আমার নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছিল।

বিগত দিনে মায়ের যত অবাধ্যতা করেছি, তা যেন এক মুহূর্তের মধ্যে চোখের সামনে এসে হাজির হলো। তিনি আমার জন্য কল্যাণ চাইতেন,

ভালোবাসতেন; কিন্তু এর প্রতিদান হিসেবে আমি তাকে কিছুই দিতাম না। তার অনুগ্রহ, স্নেহ-মমতার কথা আমার বেশি বেশি স্মরণ হতে লাগল। নিজের জন্য আফসোস ছাড়া আর কিছুই হলো না।

আহ! আমি মা-বাবার কতটাই অবাধ্য ছিলাম! আমার মন আমাকে বলছে, একটু ভাবো তো আখেরাতে তোমার সঙ্গে এর জন্য কী আচরণ করা হবে?

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

> 'আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে যাবে না।' *[সহিহ বুখারি, হাদিস নং ৫৯৮৪]*

মায়ের চেয়ে ঘনিষ্ঠ আত্মীয় আর কে আছে! আমি ভয় পাচ্ছিলাম মায়ের অবাধ্যতার কারণে দুনিয়াতেই না জানি আমার ওপর সাজা শুরু হয়ে যায়। আমার সন্তানও আমার সঙ্গে একই আচরণ করবে।

আমি কেঁদে কেঁদে দোয়া করতে থাকলাম। হে আল্লাহ! যদি আমার মা জীবিত হয়ে আবার আসত, তাহলে আমি তার কপালে চুমু খেতাম। তার পা আমার অশ্রু দ্বারা ধুইয়ে দিতাম। তিনি বৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও আমার সঙ্গে সদাচরণ করেছেন। তিনি আমাকে গর্ভে ধারণ করেছেন, আমাকে দুধ পান করিয়েছেন, আমার জন্য রাত জেগেছেন! অথচ আমার অন্তর কত শক্ত!

আমি নামাজে দাঁড়িয়ে গেলাম। এরপর কুরআন হাতে নিলাম পড়ার জন্য। কিন্তু আমার জিহ্বা আটকে এলো। আমার চোখে অশ্রুর বন্যা বইয়ে গেল। আমি আমার ভেতরের দুঃখ-কষ্টগুলো বের করে দেয়ার চেষ্টা করলাম। অন্তর থেকে দোয়া বেরিয়ে এলো এবং শরীরের প্রতিটি লোম থেকে যেন আমিন আমিন বলা হচ্ছিল। আমি আমার প্রভুর সঙ্গে অঙ্গীকার করলাম, মায়ের মৃত্যুর পর আমি তার সঙ্গে সদাচরণ করব। তার জন্য দোয়া করব। তার জন্য সদকা দেব। আল্লাহর কাছে তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। আল্লাহ যেন আমাকে এই অঙ্গীকারে স্থির থাকার তাওফিক দান করেন। আমি বারবার এই দোয়া করছিলাম-

يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ

> 'হে অন্তর পরিবর্তনকারী! আমার অন্তরকে দীনের ওপর দৃঢ় রাখুন।' *[তিরমিজি, হাদিস নং ২১৪০]*

আমি নামাজ সম্পন্ন করলাম। পরে নিজের সংরক্ষিত কিছু রেজিস্ট্রার ঘাঁটতে থাকলাম। সেখানে কিছু অশ্লীল সিডি-ক্যাসেট ছিল তা বের করে পুড়িয়ে

দিলাম। পকেটে হাত দিয়ে কিছু টাকা পেলাম, যা সেদিন কনসার্ট থেকে পাওয়া। আমি টাকাগুলো হাতে নিয়ে ছিঁড়ে ফেললাম। অতীত আমাকে বারবার পীড়া দিতে লাগল। আমি আবার আল্লাহর কাছে দোয়া করলাম। অতীত কর্মের জন্য ক্ষমা চাইলাম। এভাবেই মায়ের চলে যাওয়া আমাকে প্রদর্শন করল সুপথ।

সত্যের সন্ধানে

হজরত সালমান ফারসি রাযি. তাঁর ইসলাম গ্রহণের কাহিনি নিজেই শুনিয়েছেন। আসুন তাঁর মুখেই শুনি।

আমি আমার বাবার সঙ্গে ইস্পাহানে থাকতাম। আমার বাবা ছিলেন জমিদার। তিনি আমাকে অগ্নিপূজায় এতটাই নিয়োজিত রেখেছিলেন যে, পূজার জন্য নির্মিত অগ্নিকুন্ডে আগুন ধরানোর দায়িত্ব দেয়া হয় আমাকে। সুতরাং আমি পূজার জন্য আগুন ধরাতাম আর তা জ্বলতে থাকত দিনের পর দিন। একদিন বাবা আমাকে একটি জায়গিরের দেখাশোনার জন্য পঠালেন। বলে দিলেন, তোমার যে দায়িত্ব তা ভালোভাবে পালন করে যথাসময়ে চলে আসবে। আমি তোমাকে ছাড়া বেশি সময় থাকতে পারি না।

আমি জায়গিরে যাওয়ার জন্য ঘর থেকে বের হলাম। খ্রিস্টান ধর্মের একটি গির্জার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। সেখানে লোকদের আওয়াজ শোনা গেল যারা ইবাদতে মগ্ন ছিল। আমি তাদেরকে দেখতে থাকলাম। এভাবে আমার পুরো দিন কেটে গেল। তাদের ইবাদতের ধরণ আমার কাছে ভালো লাগল এবং আমি এর প্রতি আসক্ত হয়ে গেলাম। আমি মনে মনে বললাম, 'এই ধর্ম আমরা যে ধর্ম পালন করি এর তুলনায় অনেক ভালো।'

আমি খ্রিস্টানদের জিজ্ঞেস করলাম: তোমাদের ধর্মের শিক্ষা আমি কোথায় পেতে পারি?

তারা বলল : সিরিয়ায়।

সন্ধ্যায় আমি আমার বাবার কাছে ফিরে এলাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, সারাদিন কোথায় ছিলে? আমি তাকে পুরো ঘটনা শোনালাম।

আমার কথা শোনার পর আমার বাবা আমাকে লোহার শিকল দিয়ে বেঁধে ফেললেন। আমি অগ্নিপূজা থেকে মুরতাদ হয়ে যেতে পারি এমন আশঙ্কা তার মধ্যে দেখা দিলো।

আমি লোক মারফত এই খবর খ্রিস্টানদের জানিয়ে দিই। আর বলে রাখি, সিরিয়া থেকে তোমাদের কাছে কোনো কাফেলা এলে আমাকে জানাবে।

একবার একটি কাফেলা এলো। তারা আমাকে খবর দিলো। কাফেলা যখন বিদায়ের সময় হলো তখন কোনোভাবে আমি শিকল থেকে মুক্ত হলাম এবং সেই কাফেলার সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেলাম। সিরিয়ায় পৌঁছে আমি সেখানকার অধিবাসীদের জিজ্ঞেস করলাম, এই খ্রিস্টান ধর্মের সবচেয়ে বড় আলেম কে?

তারা আমাকে তাদের বড় পাদ্রীর কথা বলল। আমি ঠিকানা নিয়ে তার কাছে গেলাম এবং বললাম আপনাদের ধর্ম আমার পছন্দ। আমার আকাঙ্ক্ষা হলো আমি আপনাদের সঙ্গী হব। আমি পাদ্রীর সঙ্গে থেকে গির্জায় ইবাদত করার অনুমতি চাইলাম।

পাদ্রী বললেন, তুমি আমার সান্নিধ্যে থাকতে পারবে, কোনো সমস্যা নেই।

আমি সেই পাদ্রীর কাছে থাকতে লাগলাম। কিছুদিনের মধ্যেই জানতে পারলাম এই পাদ্রী খুবই মতলববাজ এবং খারাপ মানুষ। তিনি লোকদেরকে দান-সদকার দিকে উদ্বুদ্ধ করেন; আর সব দান-সদকা একাই নিজে ভোগ করেন। ফকির-মিসকিনদের কোনো অংশ দেন না। এই অসততার কারণে আমি তাকে খুবই খারাপ দৃষ্টিতে দেখতাম।

আল্লাহ নিজের ফায়সালা করে দিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই এই পাদ্রী মারা গেলেন। তার দাফন-কাফনের জন্য যখন খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের লোকের একত্রিত হলেন, তখন আমি তাদের কাছে প্রকৃত বিষয় ফাঁস করে দিলাম। তিনি মানুষের দেয়া সব দান-সদকা কুক্ষিগত করেছেন এর বিবরণ দিলাম। সব শুনে খ্রিস্টান লোকেরা হতবাক! তারা আমার কাছে জানতে চাইলেন এই অভিযোগের সত্যতা কী! তখন আমি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে পাদ্রীর কুক্ষিগত সোনা-রুপার ভান্ডার দেখালাম। তারা সব দেখে রাগে-ক্ষোভে ফেটে পড়ল। বলল সে তাহলে আমাদেরকে এতদিন ধোঁকায় রেখেছিল! আমরা তাকে দাফন করব না। সুতরাং তারা পাদ্রীর লাশ শূলিতে ঝুলিয়ে দিলো। লোকেরা এতে ঘৃণার সঙ্গে লাশে পাথর মারল। পরে তার স্থলে অন্য আরেকজনকে পাদ্রী বানানো হলো।

আমি এই নতুন পাদ্রীকে অনেক ভালো পেলাম। তিনি দুনিয়ার প্রতি বিমুখ এবং আখেরাতমুখি। রাত-দিন ভালো কাজে নিমগ্ন থাকতেন। তার সুন্দর আচরণের জন্য আমি তাকে খুবই ভালোবাসতাম। দীর্ঘ সময় আমি তার সঙ্গে থাকলাম।

তার মৃত্যুর সময় যখন ঘনিয়ে এলো তখন আমি তাকে বললাম, আমি তো আপনার সঙ্গে দীর্ঘ সময় ছিলাম। আপনাকে অনেক ভালো পেয়েছি। আপনার প্রতি আমার ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা সর্বোচ্চ পর্যায়ে। আপনার চলে যাওয়ার সময় ঘনিয়ে এসেছে। আপনি চলে গেলে আমার জন্য আপনার কী নির্দেশনা? আমি কার সান্নিধ্যে যাবো?

পাদ্রী বললেন, হে বাছা! আল্লাহর কসম লোকেরা ধ্বংসের রাস্তায় রয়েছে। তারা আসল দীন বদলে দিয়েছে। এই মুহূর্তে দুনিয়াতে এমন কেউ আছে বলে আমার জানা নেই যে সহিহ দীনের ওপর আছে। তবে মুসল শহরে এক ব্যক্তি আছেন যিনি আমাদের মতো সহিহ দীনের ওপর আছেন। তুমি সেখানে চলে যাবে এবং তার সঙ্গ লাভ করবে।

পাদ্রী মারা যাওয়ার পর আমি মুসল চলে গেলাম। পাদ্রী আমাকে যে লোকের ব্যাপারে বলে দিয়েছিলেন আমি তার কাছে গেলাম। তাকেও খুব ভালো মানুষ হিসেবে পেলাম। কিন্তু কিছুদিন পর ওই ব্যক্তিও মারা গেলেন।

তার মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলে আমি তার কাছে আরজ করলাম, অমুক পাদ্রী আমাকে আপনার কাছে আসতে বলেছিলেন, এজন্য আমি আপনার কাছে আসি। এবার আপনি আল্লাহর ডাকে সাড়া দিয়ে চলে যাচ্ছেন। এবার আমার জন্য আপনার কী নির্দেশনা!

পাদ্রী বললেন, আল্লাহর কসম দুনিয়াতে এমন কাউকে দেখছি না যিনি আমাদের মতো সহিহ দীনের ওপর কায়েম আছেন। তবে নসিবাইনে (তুরস্ক) এক ব্যক্তি আছেন তুমি তার কাছে চলে যাও।

পাদ্রীর ইন্তেকালের পর আমি তার কথা মতো তুরস্কের ওই শহরে গেলাম। সেখানে গিয়ে আমি তাকে আমার পরিচয় দিলাম এবং আগের দুই পাদ্রীর নির্দেশনা সম্পর্কে বললাম।

পাদ্রী বললেন, ঠিক আছে তুমি আমার কাছে থাকো। আমি থাকতে শুরু করলাম। আমি তাকেও আগের দুই পাদ্রীর মতোই পেলাম। কিন্তু কিছুদিন পর এই পাদ্রীরও সময় ঘনিয়ে এলো। তিনিও পরকালযাত্রার প্রাক্কালে উপনীত। আমি তাকে বললাম, আগের দুই পাদ্রী অন্তিম মুহূর্তে আমাকে নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। এবার আপনার নির্দেশনা কী?

তিনি বললেন, আমিও এমন কাউকে পাচ্ছি না যিনি সত্য দীনের ওপর আছেন। তবে রোমের (বর্তমান তুরস্ক) উমুরিয়া এলাকায় এক ব্যক্তি

আছেন। তুমি চাইলে তার কাছে চলে যেতে পারো। তিনিও আমাদের মতো সঠিক দীনের ওপর আছেন।

এই পাদ্রীও মারা গেলেন। আমি উমুরিয়ার পাদ্রীর দরবারে হাজির হলাম। তাকে আগের পুরো ঘটনা শোনালাম। তিনিও আমাকে তার দরবারে থাকার অনুমতি দিলেন। আমি এখানে থাকতে শুরু করলাম। তিনি খুবই ভালো মানুষ ছিলেন।

কিছুদিন পর তারও মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো। আমি তার কাছেও আগের মতো জানতে চাইলাম আমার করণীয় সম্পর্কে।

তিনি বললেন, আমি এই মুহূর্তে দুনিয়াতে এমন কাউকে দেখছি না যার কাছে তোমাকে পাঠাবো। তবে শেষ নবী আসার সময় ঘনিয়ে এসেছে। তিনি আসবেন আরবে দীনে ইবরাহিমের ওপর। ওই নবী খেজুর বাগান সমৃদ্ধ ভূমির দিকে হিজরত করবেন। তার কিছু সুস্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। তিনি হাদিয়া কবুল করবেন, সদকা কবুল করবেন না। তার দুই কাঁধের মাঝামাঝি স্থানে মোহরে নবুওয়াত থাকবে। তুমি ওই নবীর সন্ধানে আরবে চলে যাও।

পাদ্রীর ইন্তেকাল হয়ে গেল। আমি আরও কিছু দিন উমুরিয়ায় থাকলাম।

একটু ভাবুন, কী পরিমাণ কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি। একমাত্র সত্যের সন্ধানে সালমান ফারসি রাযি. কী সাধনাই না করেছেন! সমুদ্রের ঢেউ, পাহাড়ের চূড়া ও জনমানবহীন মরুভূমি কোনো কিছুই তাঁর সত্যের অনুসন্ধানে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি। যেকোনো মূল্যে সত্য ধর্মের সন্ধান পাওয়াই ছিল তাঁর লক্ষ্য।

ইতিহাসবিদরা লিখেন, সালমান ফারসি রাযি. দীর্ঘ হায়াত পেয়েছিলেন। এজন্য তিন ধর্ম অগ্নিপূজা, খ্রিস্টান ও ইসলামের অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন। তাঁর অনুসন্ধানের মূল বিষয় ছিল সত্য দীন লাভ করা। এজন্য দীর্ঘ সফর করেছেন। অনেক কঠিন পথ মাড়িয়েছেন। বেশ কিছুদিন উমুরিয়ায় থাকার পর তিনি পাদ্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী আরবের পথ ধরলেন। তিনি মদিনার পাশে এলেন। কথায় আছে, 'যে অনুসন্ধান করে সে পায়'। তিনিও পেলেন। অবশেষে রাসুলের দরবারে তিনি হাজির হলেন এবং ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন। এভাবে তিনি একজন প্রখ্যাত সাহাবির মর্যাদা লাভ করলেন। ইতিহাসের পাতায় চিরদিন স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে তাঁর নাম এবং কঠিন সংগ্রাম ও সাধনার কথা। *[মুসনাদে আহমদ]*

মন্দের চাবি

তার সঙ্গে ছিল আমার গভীর সম্পর্ক। আমরা একজন আরেকজনকে না দেখলে থাকতে পারতাম না। হঠাৎ একদিন তার এক্সিডেন্টের খবর পেলাম। কিছুক্ষণ পর জানতে পারলাম, সে আর নেই। তার মৃত্যুতে আমি খুবই কষ্ট পাই। আমি মহা দুশ্চিন্তায় পড়ে যাই। তার মৃত্যু হয়ে গেছে এজন্য এই দুশ্চিন্তা নয়। কারণ মৃত্যু তো অনিবার্য বাস্তবতা। সবাইকে একদিন মরতে হবে। আমার দুশ্চিন্তার কারণ হলো পরকালে তার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে? সে ছিল ইন্টারনেটে দক্ষ। অশ্লীল ছবি আর ভিডিও সংগ্রহ করা ছিল তার নেশা। সে নগ্ন ছবির একটি ওয়েবসাইটও চালাত। অনেক লোক তার সেই ওয়েবসাইটে নিবন্ধন করে। সে একটু সময় বিরতি দিয়ে দিয়ে সেখানে নতুন নতুন ছবি ও ভিডিও আপলোড করত।

তার আকস্মিক মৃত্যুতে অনেক সমস্যা দেখা দিলো। একটি সমস্যা হলো ওই ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ড একমাত্র তার কাছেই ছিল। এটা আমাদের কারও জানা ছিল না। ফলে সেই সাইট বন্ধ করার কোনো সুযোগ ছিল না। আমি যখন তার লাশ কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমার মনের ভেতর উদয় হচ্ছিল কবরে তার সঙ্গে কী আচরণ করা হবে? তাকে কী অবস্থার মুখোমুখি হতে হবে? অশ্লীল ছবিগুলোর কী হবে? এভাবে একের পর এক প্রশ্ন আমার সামনে উদয় হলো। এর মধ্যেই আমরা কবরস্থানে পৌঁছে গেলাম। কবরস্থানের পরিবেশ ভিন্ন। চারদিকে শুনশান নীরবতা। কবরের পর কবর! কত লোক এখানে শুইয়ে আছে, অথচ নেই কোনো সাড়-শব্দ। আমার বন্ধুটির জন্য অনেকেই কাঁদছেন। কিন্তু আমার মনে মনে প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে এই কান্নায় তার কী লাভ হবে? কবরে তার কী অবস্থা হবে?

আমরা তাকে দাফন করলাম। অন্ধকার-নির্জন কবরে তাকে একা রেখে সবাই ফিরে এলাম। পরিবার পরিজন এবং অনেক কষ্টে উপার্জিত সব সম্পদই রয়ে গেছে। তার সঙ্গে গেছে শুধু আমল। কিন্তু আমল আর কী ছিল!

তার মা স্বপ্নে দেখলেন, ছেলের কবরে অনেকেই প্রশ্রাব করছে। তিনি এর ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। কিন্তু প্রকৃত বাস্তবতা কি তার জানা আছে! আমার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট, যারা তার কবরে প্রশ্রাব করছিল তারা হলো তার ভিডিও গ্রাহক। আফসোস! সে এসব গুনাহের বোঝা কীভাবে একা বহন করবে!

নবী করিম ﷺ বলেছেন-

> 'যে ব্যক্তি কোনো ভ্রষ্টতার দিকে লোকদের আহ্বান করে, তার ওপরও গুনাহের এতটুকু বোঝাই আরোপ করা হবে যতটুকু গোনাহকারীর ওপর আরোপ হবে। অথচ এর দ্বারা ওই গুনাহ থেকে বিন্দু পরিমাণও কমানো হবে না। *[মুসলিম, হাদিস নং ২৬৭৪]*

আমি আমার বন্ধুকে এই গুনাহের বোঝা থেকে কিছুটা মুক্ত করতে প্রাণপণ চেষ্টা করেছি। যে কোম্পানি এই ওয়েবসাইটটি করে দিয়েছে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছি। কিন্তু তারা এ ব্যাপারে অপারগতা দেখিয়েছে। এমনকি এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতেও তারা প্রস্তুত নয়। কারণ গোপন নাম্বার আমার জানা নেই। শত চেষ্টা করেও আমি তাদেরকে বোঝাতে পারিনি। তখন নবী করিম ﷺ -এর এই কথাটি আমার খুব মনে পড়েছে-

> 'নিশ্চয় কিছু লোক মন্দের চাবি এবং নেকির তালা হয়ে থাকে।' *[সুনানে ইবনে মাজাহ, হাদিস নং ২৩৭]*

আমি আমার বন্ধুকে অনেক বোঝাতাম। লোকদের গুনাহের চাবি না হওয়ার আহ্বান জানিয়েছি। কিন্তু বন্ধু আমার কথা এক কান দিয়ে ঢুকিয়েছে আরেক কান দিয়ে বের করে দিয়েছে। বলেছে, আমি তো এখনও যুবক, বৃদ্ধ হওয়ার পর তওবা করে নেব। কিন্তু এসবই ছিল তার জন্য ধোঁকা। জীবনের কী ভরসা আছে যে বৃদ্ধ হবে!

এভাবে না জানি কত যুবক ধোঁকায় পড়ে গুনাহের সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছে! কত যুবক-যুবতি এই ধোঁকায় ফেঁসে গেছে!

সে মরে গেছে কিন্তু তার কর্ম এখনও অব্যাহত আছে। কেয়ামতের দিন তাকে সবার কর্মের জবাব দিতে হবে। তার ছবির কারণে কে কে বিপথগামী হয়েছে এর প্রত্যেকটির ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। এভাবে না জানি কত লোকের বোঝা তাকে বহণ করতে হবে! দোয়া করি আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দিন! আমিন।

সাত্তার ও গাফফার যিনি

মুসা আ.-এর যুগে বনি ইসরাইলের লোকেরা দুর্ভিক্ষের শিকার হলো। সবাই একত্রিত হয়ে এ ব্যাপারে মুসা আ.-এর শরণাপন্ন হলো। তারা বলল, হে কালিমুল্লাহ! আপনি আপনার প্রভুর দরবারে দোয়া করুন যাতে তিনি আমাদের ওপর থেকে দুর্ভিক্ষ সরিয়ে তার রহমত নাজিল করেন।

মুসা আ. সবাইকে নিয়ে একটি খোলা প্রান্তরে গেলেন। সবার মধ্যে দুর্ভিক্ষের ছাপ। ঠোঁট-মুখ শুকানো, চুল এলোমেলো। সঙ্গে পশু-পাখি, শিশু-বৃদ্ধ সবাই রয়েছে। তাদের সংখ্যা প্রায় ৭০ হাজার। মুসা আ. তাদের নিয়ে আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন। বললেন, হে আল্লাহ! তোমার রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ কর, ফসল উৎপন্ন করে দাও। দুর্ভিক্ষের হাত থেকে আমাদেরকে রহমত কর।

কিন্তু তারা যত দোয়া করছে তাপমাত্রা তত বাড়ছে। মুসা আ. কাকুতি-মিনতি করে বললেন, হে আল্লাহ! আমাদের ওপর রহমত কর, আমাদের ওপর রহমতের বৃষ্টি বর্ষণ কর।

আল্লাহ বললেন, আমি তোমাদের ওপর বৃষ্টি কীভাবে বর্ষণ করব? তোমাদের সঙ্গে এমন এক হতভাগা আছে যে ৪০ বছর ধরে একাধারে আমার অবাধ্যতা করে যাচ্ছে। তুমি ঘোষণা করে দাও, এই হতভাগা যেন তোমাদের এখান থেকে চলে যায়, তাহলে আমি তোমাদেরকে বৃষ্টি দেব। একজন অবাধ্য লোকের কারণে সবাই অনাবৃষ্টিতে ভুগছে।

মুসা আ. উচ্চস্বরে ঘোষণা দিলেন, এখানে কে এমন আছো যে ৪০ বছর ধরে আল্লাহর নাফরমানিতে লিপ্ত এখান থেকে বেরিয়ে যাও। তোমার কারণে নারী, শিশু, বৃদ্ধ এবং পশু-পাখি পর্যন্ত কষ্ট করছে; দুর্ভিক্ষে ভুগছে।

ওই গুনাহগার ডানে-বামে তাকালো। দেখল কেউ বের হচ্ছে না। সুতরাং সে বুঝে গেল আমাকেই বেরিয়ে যেতে হবে।

সেই লোক মনে মনে বলল, আমি যদি এখন সবার সামনে বেরিয়ে যাই তাহলে সবাই আমাকে চিনে ফেলবে। সারা জীবন তারা আমাকে এর জন্য

ভৎর্সনা করবে। আবার এখানে বসে থাকলেও রহমতের বৃষ্টি বর্ষিত হবে না। সবাইকে এর জন্য কষ্ট করতে হবে। লোকটি তার চেহারা কাপড় দিয়ে ঢেকে দিলো। আল্লাহর দরবারে কেঁদে কেঁদে চুপি চুপি দোয়া করলো, হে আল্লাহ! আমি বিগত ৪০ বছর ধরে তোমার নাফরমানিতে লিপ্ত। তুমি আমাকে ধরনি, অবাধ্যতার সুযোগ দিয়েছো। আমি আমার অপরাধ এবার বুঝতে পেরেছি। আমি তোমার কাছে আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও। তুমি আমার দোয়া কবুল কর।

তার দোয়া তখনও শেষ হয়নি এর মধ্যেই আসমান থেকে মুষলধারে বৃষ্টি বর্ষিত হতে থাকল। মুসা আ. খুবই বিস্মিত হলেন। তিনি আল্লাহ তায়ালাকে বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করেছ এজন্য আমরা তোমার প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমাদের মধ্য থেকে কেউ বেরিয়ে যায়নি তবুও তুমি বৃষ্টি দিয়েছ। এর কারণ কী?

আল্লাহ বললেন, যার কারণে তোমাদের ওপর বৃষ্টিপাত বন্ধ রেখেছিলাম এখন তার কারণেই বৃষ্টি দিয়েছি।

মুসা আ. আবেদন করলেন, সেই সৌভাগ্যবান তওবাকারী লোকটি কে?

আল্লাহ বললেন, হে মুসা! সে যখন আমার অবাধ্যতা করত আমি তখনও তার নাম সবার কাছে গোপন রেখেছি, এখন সে তওবা করে অনুশোচনার অশ্রু ফেলে আমার দরবারে ফিরে এসেছে, আমার কাছে ক্ষমা চেয়েছে, এখনও আমি তার নাম গোপন রাখব। তার নাম উল্লেখ করে এখন আমি তাকে তোমাদের কাছে অপদস্থ করতে চাই না। *[আত-তাওয়াবিনা লিইবনি কুদামা]*

ইসলামের জন্য নিবেদিত জীবন

তোফায়েল ইবনে আমর ‘দাওস’ গোত্রের সরদার ছিলেন। গোত্রের লোকজন তার কথা খুব মনোযোগ দিয়ে শুনতো এবং তা পালন করত। তিনি ব্যবসায়িক কাজে নিজের শহর থেকে মক্কায় এলেন। কুরাইশের শীর্ষস্থানীয় লোকেরা তাকে ঘিরে রাখল। তাদের ভয় ছিল তিনি যেন আবার মুহাম্মদের কাছে ভিড়ে ইসলাম গ্রহণ না করে! সুতরাং তারা তোফায়েল ইবনে আমর রাযি.-এর কাছে মুহাম্মদ ﷺ সম্পর্কে নানা সমালোচনা করলেন এবং মুহাম্মদের কাছে ভিড়তে বারণ করলেন।

কুরাইশের শীর্ষ ব্যক্তিরা বললেন, হে তোফায়েল! আপনি আমাদের শহরে এসেছেন। এখানে এক লোক আছে তিনি আমাদের সবকিছু নড়বড়ে করে দিয়েছেন। তিনি আমাদের মধ্যে বিভক্তি ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আমাদের লোকদের নিজের দিকে টেনে নিচ্ছেন। তার কথায় এতো যাদু যে, মানুষের অন্তর সহজেই তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে। তিনি লোকদেরকে ভাই-বোন, মা-বাবা এবং স্ত্রী-সন্তানের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করে দেন। আপনাকে নিয়ে আমাদের শঙ্কা। আপনার দ্বারা আবার যেন আপনার সম্প্রদায়ের লোকদের তার দিকে টেনে নিয়ে না যায়! সুতরাং আপনি একটু সতর্ক থাকবেন। তার সঙ্গে কথা বললে তার কথায় কান দেবেন না।

তোফায়েল রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম, তারা এসব কথা বলে বলে আমার কান ভারী করে ফেলল। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম মুহাম্মদের কোনো কথাই শুনব না। পরে আমি বায়তুল্লাহয় গেলাম। রাসুল ﷺ তখন খানায়ে কাবার পাশে নামাজ পড়ছিলেন। আমি তার কাছে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়তে থাকলাম। আল্লাহ না চাওয়া সত্ত্বেও তাঁর কিছু কথা আমাকে শুনিয়ে দিলেন। তাঁর কথাগুলো আমার কাছে খুবই ভালো মনে হলো।

আমি মনে মনে বললাম, আমি তো ভালো ও সতর্ক কবি। আমি তো ভালো-মন্দের পার্থক্য করতে জানি। আমি তাঁর কথা কেন শুনব না? তিনি ভালো কথা বললে আমি গ্রহণ করে নেব। মন্দ কথা বললে তা প্রত্যাখ্যান করব।

আমি তখনও বসা ছিলাম। এর মধ্যেই রাসুল ﷺ উঠে গেলেন এবং বাড়ির পথে রওয়ানা করলেন। আমিও তাঁর পিছু পিছু যেতে লাগলাম। তাঁর কাছে গিয়ে আরজ করলাম, হে মুহাম্মদ! আপনার সম্প্রদায়ের লোকেরা আপনার ব্যাপারে আমার কাছে এই এই বলেছে। তাদের কথায় আমার কান এতটাই ভারী হয়ে উঠে যে, আমি মনে মনে সিদ্ধান্ত নিই আপনার কথা শুনব না। কিন্তু আমার মন না চাইলেও আপনার কিছু কথা শুনে আমি আপনার ভক্ত হয়ে গেছি। আপনি দয়া করে আপনার কিছু কথা আমাকে শোনান।

তোফায়েল রাযি. বলেন, রাসুল ﷺ আমার সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। তিনি কুরআনে কারিম তেলাওয়াত করলেন। আল্লাহর কসম! আমি এর চেয়ে ভালো কোনো কথা কোনোদিন শুনিনি এবং এর চেয়ে ভালো কোনো শিক্ষা কোনোদিন পাইনি। আমি সঙ্গে সঙ্গে কালেমায়ে শাহাদাত পড়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলাম।

পরে আমি রাসুল ﷺ -এর কাছে আরজ করলাম, আমি আমার সম্প্রদায়ের সরদার। আমি কোনো কথা বললে লোকেরা তা মানে। এবার আমি তাদের কাছে যাচ্ছি। আমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেব। আপনি আমার জন্য একটু দোয়া করে দেন, আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা যেন আমার কথা শুনে এবং ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নেয়।

রাসুল ﷺ তাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে এই দোয়া করলেন: 'হে আল্লাহ! তুমি তাঁকে কোনো নিদর্শন দান কর।'

তোফায়েল রাযি. বলেন, পরে আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গেলাম। সম্প্রদায়ের লোকদের দেখার সঙ্গে সঙ্গে আমার চোখে স্বয়ংক্রিয়ভাবে একটা আলো সৃষ্টি হলো। আমি আল্লাহকে বললাম, হে আল্লাহ! এই আলো আমার চোখ থেকে সরিয়ে অন্য কোথাও স্থাপন করে দাও। কারণ আমার ভয় হচ্ছে, এই আলো দেখে আমার সম্প্রদায়ের লোকেরা বলবে, তিনি নিজের ধর্ম ত্যাগ করেছেন বলে মাবুদ তার শাস্তি হিসেবে চোখে এই রোগ দিয়েছেন। এই দোয়া করতেই আলো আমার চোখ থেকে সরে হাতের লাঠির মধ্যে স্থানান্তরিত হলো। লোকেরা লাঠিতে এই আলো দেখতে লাগল। তারা ভাবল এটা কোনো আলো নয়, ঝলমল করা কোনো বাতি।

তিনি বলেন, আমি যখন বাড়ি পৌঁছলাম তখন আমার বৃদ্ধ বাবা এলেন আমার কাছে। আমি বললাম, আব্বাজান! আপনি আমার থেকে দূরত্বে থাকবেন কেন? এখন তো আমার আর আপনার সম্পর্ক এক নয়।

আব্বাজান জিজ্ঞেস করলেন, কী এমন হলো যে সম্পর্ক ভিন্ন হয়ে গেল!

আমি বললাম, আমি ইসলামের ছায়াতলে প্রবেশ করে মুহাম্মদ ﷺ -এর অনুসারী হয়ে গেছি।

আব্বাজান বললেন, হে প্রিয় ছেলে! আমার দীনও সেটাই যা তোমার দীন। এরপর তিনি কালেমায়ে শাহাদত পড়ে ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন।

এর মধ্যেই আমার স্ত্রী এলেন। আমি তাকেও সেই কথাই বললাম যা বাবাকে বলেছিলাম। পরে তিনিও ইসলাম গ্রহণ করেন।

পরে আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে গেলাম। তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিলাম। কিন্তু তারা একটু গড়িমসি করছিল। আমি সঙ্গে সঙ্গে মক্কা মুকাররমার দিকে রওয়ানা দিলাম। রাসুল ﷺ -এর দরবারে হাজির হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসুল! 'দাওস' গোত্রের লোকেরা আমার দাওয়াত কবুল করতে গড়িমসি করছে। আপনি তাদের জন্য বদদোয়া করে দিন।

রাসুল ﷺ আমার কথা শুনে দুই হাত উঠালেন এবং কেবলার দিকে মুখ করলেন। আমি মনে মনে বললাম, এবার 'দাওস' গোত্রের লোকদের ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু রাসুল ﷺ হাত উঠিয়ে এই দোয়া করলেন-

'হে আল্লাহ! দাওস সম্প্রদায়কে হেদায়েত দাও। হে আল্লাহ! দাওস সম্প্রদায়কে সঠিক পথের দিশা দাও। হে আল্লাহ! দাওস সম্প্রদায়কে তুমি সুমতি দাও।'

এরপর রাসুল ﷺ আমাকে বললেন, তুমি তোমার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে যাও। তাদেরকে আল্লাহর পথের দাওয়াত দাও। তাদের সঙ্গে তুমি নম্র ও কোমল আচরণ কর।

হ্যাঁ, তিনিই হলেন রহমতের নবী, যার কাছে বদদোয়ার আবেদন করলেও তিনি দোয়া করেন হেদায়াতের। তিনি বদদোয়ার পরিবর্তে হেদায়াতের ফুল ছিটিয়ে দেন। কেন হবে না! তিনি তো রাহমাতুল লিল আলামিন। শুধু মানুষের জন্য নয়, সমস্ত প্রাণীকুলের জন্য আল্লাহ তাঁকে রহমত হিসেবে পাঠিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর দয়া ও কোমলতার আলোচনা করে বলছেন-

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ۝

'তোমাদের কাছে এসেছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসুল। তোমাদের দুঃখ-কষ্ট তার পক্ষে দুঃসহ। তিনি তোমাদের মঙ্গলকামী; মুমিনের প্রতি স্নেহশীল, দয়াময়।' *[সুরা তওবা, আয়াত-১২৮]*

তোফায়েল দাওসি রাযি. বলেন, পরে আমি দাওস সম্প্রদায়ের মধ্যে অব্যাহতভাবে দাওয়াতের কাজ শুরু করলাম। তাদের সবাই ইসলামের ছায়াতলে আশ্রয় নিলো এবং শাহাদাতের সাক্ষ্য দিলো। এই সময়ের মধ্যে রাসুল ﷺ মক্কা থেকে হিজরত করে মদিনায় চলে এসেছেন। বদর, উহুদ ও খন্দকের যুদ্ধও হয়ে গেছে। আমি আমার সম্প্রদায়ের লোকদের'সহ তাঁর দরবারে ওই সময় হাজির হলাম, যখন তিনি খায়বার যুদ্ধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিলেন। তিনি খায়বার যুদ্ধে শরিক অন্য মুসলমানের সঙ্গে আমাদেরকে গনিমতের মালের অংশ দিলেন। এরপর মক্কা বিজয় পর্যন্ত আমি পুরো সময় রাসুল ﷺ -এর দরবারেই ছিলাম।

ঐতিহাসিকগণ লিখেন, তোফায়েল ইবনে আমর দাওসি রাযি. রাসুল ﷺ-এর কাছে আমর বিন হামামার মূর্তি 'জুলকিফফিন'কে জ্বালিয়ে দেয়ার অনুমতি চাইলেন। রাসুল ﷺ অনুমতি দিলেন। তোফায়েল দাওসি রাযি. ওই মূর্তি জ্বালিয়ে দেয়ার আগে তার কাছে এসে এই কবিতা আবৃত্তি করতে থাকলেন-

يا ذا الكفين لست من عبادكا

ميلادنا اقدم من ميلادكا

انى حشوت النار فى فوادكا

হে জুলকিফফিন! আমি তোমার পূজারি নই
আমার জন্ম তোমার জন্মের চেয়ে আগে।
আমি তোমার অন্তরে আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছি।

এরপর তোফায়েল ইবনে আমর রাযি. অব্যাহতভাবে ইসলামের প্রতি নিজের আনুগত্য ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ দিয়েছেন। প্রায় প্রতিটি যুদ্ধেই তিনি শরিক ছিলেন। রাসুল ﷺ-এর ইন্তেকালের পর চারদিকে মুরতাদের তুফান শুরু হলো। মুসায়লামা বিন কাজ্জাবের বিরুদ্ধে যে বাহিনী পাঠানো হয়েছিল,

সেখানেও তিনি ছিলেন। সেই যুদ্ধে তার ছেলে আমর বিন তোফায়েল রাযি.ও ছিলেন।

ইয়ামামা যাওয়ার পথে তোফায়েল ইবনে আমর রাযি. একটি স্বপ্ন দেখলেন। তিনি সঙ্গীদের বললেন, আমি একটি স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা এর ব্যাখ্যা বল। তিনি বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার মাথা মুণ্ডানো এবং আমার মুখ থেকে একটি পাখি বেরিয়ে যাচ্ছে। পরে এক নারীর সঙ্গে আমার দেখা হলো। সে নারী আমাকে তার লজ্জাস্থানে ঢুকিয়ে নিলো। আমি আমার ছেলে আমরকে দেখলাম সে আমাকে পেরেশান হয়ে খুঁজছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে আমার তালাশ ছেড়ে দেয়।

লোকেরা এই স্বপ্নের কথা শুনে বললেন, ভালো।

তোফায়েল দাওসি রাযি. বলেন, আল্লাহর কসম! আমি এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিজেই খুঁজে বের করব।

সঙ্গীরা জানতে চাইলেন, সেটা কীভাবে?

তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডানোর ব্যাখ্যা হলো আমার মাথা কেটে নেয়া হবে। আমার মুখ থেকে বের হওয়া পাখি হলো আমার রুহ। আর জনৈক নারী তার লজ্জাস্থানে আমাকে ঢেকে নেয়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে মাটি খুড়ে আমার জন্য কবর করা হবে। পরে আমার ছেলে আমার সন্ধান করবে এবং পরে থেমে যাবে। এর ব্যাখ্যা হলো সেও শাহাদত লাভের চেষ্টা করবে।

যুদ্ধ শুরু হলো। তোফায়েল ইবনে আমর রাযি. শহীদ হয়ে গেলেন। তার ছেলে আমর বিন তোফায়েল রাযি.ও গুরুতর আহত হলেন। তবে তিনি মারা গেলেন না। পরে আমিরুল মুমিনিন হযরত ওমর রাযি.-এর সময়কালে ইয়ারমুকের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন।

আল্লাহ তায়ালা শহীদদের ব্যাপারে বলেছেন-

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ۭ بَلْ اَحْيَاۗءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰىھُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۙ وَ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۙ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝

'আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনও মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোনো ভয় ভীতিও নেই এবং কোনো চিন্তা ভাবনাও নেই।' *[সূরা আলে ইমরান : আয়াত ১৬৯-১৭০]*

জান্নাতের পথ

তার বয়স হয়েছিল ১৬ বছর। তবে এই বয়সেই দীনের ভালোবাসা গভীরভাবে স্থান করে নিয়েছিল তার অন্তরে। সবসময় সে কুরআনে কারিম তেলাওয়াত ও আল্লাহর জিকিরে মশগুল থাকত। যখনই নামাজের সময় হত সে সব ছেড়ে নামাজে চলে যেত। একদিন সে অভ্যাস অনুযায়ী কুরআন তেলাওয়াত করছিল এবং ফজরের ইকামতের অপেক্ষায় ছিল। মুয়াজ্জিন যখন ইকামত শুরু করলেন তখন সে কুরআন শরিফ আলমারিতে রাখল। পরে কাতারে দাঁড়ানোর জন্য সামনে এগিয়ে গেল। কিন্তু হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। লোকজন তাকে ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেল।

যে চিকিৎসক তাকে প্রথমে রিসিভ করেন তিনি বলেন তাকে যখন নিয়ে আসা হয় তখন সে ছিল একটি লাশের মতো। তার চেহারা দেখে আমি বুঝতে পারলাম তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছে। তার হার্ট অ্যাটাকটি ছিল মারাত্মক। শ্বাসটা কোনোরকম টিকে আছে। আমি তাকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করলাম। যে চিকিৎসক তার চিকিৎসা করবেন, তিনি যন্ত্রপাতি গুছাচ্ছিলেন। আমি দ্রুত তার যন্ত্রপাতি গুছাতে সহযোগিতা করছিলাম। এর মধ্যে ছেলেটি ডাক্তারের হাত ধরে বিড়বিড় করে কী যেন বলছিল। ডাক্তার তার মুখের কাছে নিজের কান নিলেন, কী বলছে তা শোনার জন্য।

হঠাৎ সে ডাক্তারের হাত ছেড়ে দিলো। ডান-বামে পার্শ্ব ফেরানোর চেষ্টা করল। এরপর উঁচু আওয়াজে বলল, আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়া আশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু ওয়া রাসুলুহু।

সে বারবার একই কালেমা পাঠ করছিল। তার হৃদকম্পন আস্তে আস্তে কমে এলো। ডাক্তাররা তাকে বাঁচানোর প্রাণপণ চেষ্টা করলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবাইকে ব্যর্থ করে সে পাড়ি জমাল পরপারে।

ডাক্তার কাঁদতে লাগলেন। এই পরিমাণ কাঁদছিলেন যে তাঁর পক্ষে দাঁড়িয়ে থাকাও কঠিন ছিল। আমরা খুবই বিস্মিত হলাম। আমরা জিজ্ঞেস করলাম,

ডাক্তার সাহেব! আপনি কাঁদছেন কেন? এটাই তো প্রথম ঘটনা নয় যে, চোখের সামনে কোনো রোগী মারা গেছে। তাহলে কাঁদছেন কেন!

ডাক্তারের কান্না যখন থামল, তখন আমরা তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এই তরুণ আপনাকে কী বলে গেছে!

ডাক্তার বললেন, সামান্য সময়ের জন্য এই তরুণের জ্ঞান ফিরল। সে চোখ খুলে ডানে বামে দেখল। পরে বুঝে গেল তাকে কোথায় নিয়ে আসা হয়েছে। পরে সে আমাকে কানে কানে বলল, ডাক্তার সাহেব! অনর্থক চেষ্টা করে লাভ হবে না। আমি বাঁচার মতো নই। আমার সময় শেষ হয়ে এসেছে। আল্লাহর কসম! আমি এই মুহূর্তে জান্নাতে আমার জায়গাটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি।

সব হারিয়ে ফিরল হুঁশ!

নিজেই নিজের ঘটনা বর্ণনা করছেন। তিনি বলেন, আমার কোনো দিন কান্নামুক্ত থাকত না। প্রতিদিন আমি একাধিকবার আত্মহত্যার প্রস্তুতি নিতাম। জীবনের প্রতি অনীহা চলে এসেছিল। আমার প্রতিটি মুহূর্ত মৃত্যু খুঁজে বেড়াত। আফসোস! আমি যদি জন্মই গ্রহণ না করতাম, তাহলে তো এই দুনিয়াতে আসতে হতো না!

আমার কাহিনির শুরুটা এক বান্ধবীর সঙ্গে। সে আমাকে একদিন তার ঘরে ডেকে নিলো। তার ইন্টারনেটের ব্যবসা ছিল। সে আমাকেও ইন্টারনেটের প্রতি আসক্ত করার চেষ্টা চালায়। আমাকে ইন্টারনেট চালানোর পদ্ধতি শেখায়। প্রায় দুই মাসে আমি ইন্টারনেটে মোটামুটি দক্ষ হয়ে গেলাম।

আমি ইন্টারনেট চালানো এবং বিভিন্ন ওয়েবসাইট ব্রাউজিং করা শিখে গেলাম। দুই মাস পর আমার স্বামীর সঙ্গে বাসায় ইন্টারনেট সংযোগ দেয়া নিয়ে ঝগড়া হয়। আমার স্বামী ছিলেন এর সম্পূর্ণ বিরোধী। শেষ পর্যন্ত আমি স্বামীকে ইন্টারনেট সংযোগে অনেকটা বাধ্য করলাম। তাকে বললাম, একা একা বাসায় থাকি, এতে সময় কাটে না। এজন্য ইন্টারনেট সংযোগ দরকার। আমার বান্ধবীও ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আমি ইন্টারনেটের মাধ্যমে সহজেই তার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারব।

স্বামী আমার কথা মেনে নিলেন। আফসোস! সে যদি এটা না মেনে নিত, তাহলে কতই না ভালো হত! এবার আমি পুরো দিন বান্ধবীদের সঙ্গে চ্যাটিংয়ে ব্যয় করি। যখনই আমার স্বামী ঘরের বাইরে যেত আমি দরজা-জানালা বন্ধ করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ইন্টারনেটে ডুবে থাকতাম। আমার মনের বাসনা হত স্বামী যত দেরি করে বাসায় ফিরবে ততই ভালো। স্বামীর প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল এবং সেও আমাকে খুব ভালোবাসত। আর্থিক সামর্থ্য কম থাকা সত্ত্বেও যথাসম্ভব সে আমার মনোবাসনা পূরণের চেষ্টা করত।

ইন্টারনেটে আমার মনোযোগ বেড়ে গেল। অবস্থা এই দাঁড়াল যে, এটা ছাড়া আর কোনো কাজে মন বসাতে পারলাম না। আগে দুই সপ্তাহ পর পর স্বামীর সঙ্গে শ্বশুরালয়ে যেতাম। এবার সেটাও হচ্ছে না।

স্বামী কখনও হঠাৎ ঘরে ঢুকে গেলে আমি দ্রুত ইন্টারনেটে খোলা লিঙ্কগুলো বন্ধ করে দিতাম। তার কাছে এটা খুব বিস্ময়ের জিনিস বলে মনে হত। আমাকে সন্দেহ করত না, কিন্তু মনে মনে তার একটা ইচ্ছা ছিল আমি ইন্টারনেটে কী করছি তা দেখা। একদিন সম্ভবত তার আগে আগে ছুটি হয়েছে অথবা আমার অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য দ্রুত বাসায় চলে এলো। হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়ায় আমি সামলে উঠতে পারিনি। সে আমার চ্যাটিং দেখে ফেলল যা আমি বন্ধ করতে পারিনি। সে একটু ধমকের সুরে বলল, ইন্টারনেটে জানার মতো প্রচুর জিনিস রয়েছে, এখানে অহেতুক সময় নষ্ট করার জায়গা না।

সময় দ্রুত গড়াচ্ছে আর আমি চ্যাটিংয়ের ফেতনায় আরও বেশি করে ফেঁসে যাচ্ছি। সন্তানের বিষয়টি কাজের মেয়ের ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আগে স্বামী ঘরে ফেরার সময় হলে আমি সেজেগুজে বসে থাকতাম। কিন্তু ইন্টারনেট আসার পর সেটা হয়ে উঠে না। ইন্টারনেটের প্রতি এতটাই আসক্ত হয়ে পড়েছিলাম যে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়লে চুপিচুপি গিয়ে কম্পিউটার খুলে বসতাম। আবার স্বামী উঠে গেছে টের পেলে চুপিচুপি বন্ধ করে দিতাম। সে জানত আমি ইন্টারনেটে অহেতুক সময় ব্যয় করছি। তবে আমাকে কঠোরভাবে তেমন কিছু বলত না এই ভেবে যে, একা একা বাসায় থাকি, সময়টা যেন ভালো কাটে। তবে সন্তানের লালন-পালনে আমার অযত্ন-অবহেলায় সে ছিল খুবই পেরেশান। সে কয়েকবার আমাকে এ ব্যাপারে বলেছে। কিন্তু আমি কেঁদেকুটে তাকে বলতাম, তুমি অফিসে চলে যাওয়ার পর সন্তান সামলাতে আমার কতটুকু কষ্ট হয়, তা বলে বুঝানো সম্ভব নয়। আমার এই কথা সে বিশ্বাস করত।

মোটকথা, আমি স্বামীসহ সবকিছুতেই বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিলাম। আগে সে ঘরের বাইরে গেলে আমি প্রায় ১০বার তার সঙ্গে ফোনে কথা বলতাম। আর ইন্টারনেট আসার পর খুব বেশি প্রয়োজন না পড়লে তাকে ফোন করতাম না। এজন্য আমার স্বামী ইন্টারনেটের ওপর খুবই বিরক্ত ছিল।

এভাবে ছয় মাস কেটে গেল। আমার বেশ কয়েকজনের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। যখন যার সঙ্গে মনে চাইত চ্যাটিং করতাম। অনেককে জানতাম সে

পুরুষ, কিন্তু আমি তার সঙ্গেও চ্যাটিং অব্যাহত রাখতাম। এক পুরুষের প্রতি আমি অনেকটা দুর্বল হয়ে গেলাম। তার কথা আমার মনকে প্রভাবিত করল। দিন দিন তার সঙ্গে সম্পর্ক গাঢ় হতে থাকল। প্রায় তিন মাস এভাবে সম্পর্ক অব্যাহত থাকল। সে আমাকে তার মধুমাখা ভালোবাসাপূর্ণ কথার ফাঁদে ফেলে দিলো।

অনেক সময় তার কথা সাধারণ বলে মনে হতো। কিন্তু শয়তান এটাকে খুবই আকর্ষণীয় হিসেবে আমার সামনে উপস্থাপন করত। এতদিন আমাদের কথাবার্তা চলল লেখার মাধ্যমে। এবার সে আমার গলার স্বর শুনতে চাইল। আমি অস্বীকার করলাম। সে তখন আমার সঙ্গে আর চ্যাটিং না করার হুমকি দিলো।

আমি তার মতলব বোঝার চেষ্টা করেছি, কিন্তু আমি ব্যর্থ হয়েছি। শেষ পর্যন্ত মাত্র একবার কথা বলব এই শর্তে তার প্রস্তাবে রাজি হলাম। আমি ভয়েজ ব্যবহার করে তার সঙ্গে কথা বললাম। যদিও এই পদ্ধতি খুব ভালো ছিল না তবুও তার আওয়াজ খুব সুন্দর এবং তার কথাবার্তা খুবই মনোমুগ্ধকর বলে মনে হলো। সে আমাকে বলল, ইন্টারনেটে তোমার আওয়াজ স্পষ্ট শোনা যায় না, তাই মোবাইল নাম্বার দাও। আমি অস্বীকার করলাম এবং তার দুঃসাহস দেখে বিস্মিত হলাম। পরে অনেক দিন চলে গেল তার সঙ্গে আর কোনো কথাবার্তা হয়নি।

আমি খুব ভালোভাবেই জানতে পেরেছি শয়তান আমার পেছনে লেগেছে। শয়তানই তার আওয়াজকে আমার কাছে হৃদয়কাড়া হিসেবে উপস্থাপন করছে। আমার শেষ লজ্জাবোধটুকুও সে কেড়ে নেয়ার ফন্দি এঁটেছে।

একদিন আমি তার সঙ্গে ফোনে কথা বললাম। সেই সময় থেকেই মূলত আমার জীবন ক্লেদাক্ত হয়ে গেল। অনেকে হয়ত ভাববে আমার স্বামী আমাকে গুরুত্ব দিতো না অথবা ঘরের বাইরে থাকত। কিন্তু বিষয়টি এমন না। সে শুধু কাজের জন্য ঘরের বাইরে যেত। সে আমার জন্য এবং সন্তানের জন্য বন্ধুবান্ধবকে পর্যন্ত ত্যাগ করেছিল।

ইন্টারনেটের প্রতি আসক্ত হয়ে যাওয়ার পর আমার স্বামী ঘরে বেশি সময় থাকুক এটা আমার কাছে ভালো লাগত না। আমি তাকে ঘরের বাইরে রাখার নানা ফন্দি আঁটতাম। আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য অফিস শেষে আরেকটি চাকরি করার প্রতি পর্যন্ত উদ্বুদ্ধ করি। সে সত্যিই আমার কথামতো কাজ করে। তার বন্ধুর সঙ্গে মিলে ছোট একটি কারখানা দেয়। এভাবে ইন্টারনেটে আমার

সময় শুধু বাড়তেই থাকে। আমার স্বামী অতিরিক্ত টেলিফোন বিলের যন্ত্রণায় অস্থির, সে দিকে আমার কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই।

এদিকে অপরিচিত সেই ব্যক্তির সঙ্গে আমার সম্পর্ক আরও বাড়তে থাকে। এক পর্যায়ে সে আমার আওয়াজ শোনার পর আমার সঙ্গে সাক্ষাতের আগ্রহ দেখায়। আমি কঠোরভাবে তার এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করি। যদিও বাহ্যিকভাবে তার সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যাপারে কঠোরতা দেখাই কিন্তু মনে মনে আমারও চাওয়া ছিল তাকে যদি একবার দেখতে পারতাম! কিন্তু তার সঙ্গে সাক্ষাতের ক্ষেত্রে অজানা একটি আতঙ্ক মনের মধ্যে কাজ করছিল।

তার পীড়াপীড়ির মাত্রা বেড়েই চলল। সে আমাকে একনজর দেখার জন্য অস্থির হয়ে উঠল। অবশেষে আমি তার এই আবদার পূরণেও রাজি হয়ে গেলাম। তবে শর্ত দিলাম এটা হবে আমাদের প্রথম এবং শেষ সাক্ষাৎ। কথামতো আমরা একটি বাজারে সাক্ষাৎ করি। আমরা দুইজন একান্তে ছিলাম। শয়তান ছাড়া আমাদের মধ্যখানে আর কেউ ছিল না।

আমি প্রথম দেখাতেই তার প্রতি কুপোকাত হয়ে যাই। শয়তান তার রূপ-সৌন্দর্য আমার কাছে বহুগুণে বাড়িয়ে উপস্থাপন করে। আমার স্বামীও রূপে-গুণে কম ছিল না। কিন্তু শয়তানের অভ্যাস হলো হারাম জিনিসকে খুব সজ্জিত ও আকর্ষণীয় করে উপস্থাপন করা।

এভাবে সাক্ষাৎ হলো। সম্পর্ক আরও গাঢ় হতে থাকল। আমি বিবাহিত এবং কয়েকটি সন্তান আছে এ দিকে তার কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কয়েকবার সে আমাকে দেখল এবং প্রেমালাপ করল। সে আমার সম্পর্কে সবকিছু জানল। এক পর্যায়ে আমার স্বামীর প্রতি সে খারাপ ধারণা পোষণ করতে থাকল।

একদিন সে স্বামীকে তালাক দিয়ে তার সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিয়ে বসল। আমি আমার স্বামীকে অপছন্দ করতে শুরু করলাম। সামান্য বিষয় নিয়ে তার সঙ্গে ঝগড়া শুরু করে দিলাম, যাতে সে আমাকে তালাক দিয়ে দেয়। আমার স্বামী খুবই বিপদজনক পরিস্থিতির মুখোমুখি হলো। বেশির ভাগ সময় ঘরের বাইরে থাকতে লাগল। পরে ঘটল এক মর্মান্তিক ঘটনা।

একদিন আমার স্বামী বলল, কোনো একটা কাজে সে পাঁচ দিনের জন্য সফরে যাচ্ছে। আমাদেরকে পিত্রালয়ে চলে যাওয়ার জন্য বলল। কিন্তু আমি তাতে রাজি হলাম না। আমি এটাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। আমার স্বামী জুমার দিন সফরে বের হলো। রবিবার দিন আমাদের সাক্ষাতের তারিখ ধার্য ছিল। আমি শয়তানের ইশারায় চুপিচুপি এক বাজারে গিয়ে তার

সঙ্গে সাক্ষাৎ করলাম। পরে একটি গাড়িতে চড়ে বসলাম। সেই গাড়ি ছুটে চলল মহাসড়ক ধরে।

জীবনে এটা প্রথমবারের মতো ঘটনা; কোনো পরপুরুষের সঙ্গে ঘর থেকে বের হয়েছি। আমি খুব চিন্তিত ছিলাম। আমি তাকে বললাম, আমি কিন্তু বেশি সময় ঘরের বাইরে থাকতে পারব না। আমার মনে ভয় ছিল, না জানি কখন স্বামী ঘরে চলে আসে। অথবা না জানি কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে যায়।

সে আমাকে বলল, তোমার স্বামী যখন এটা জানতে পারবে তখন সে নিজেই তোমাকে তালাক দিয়ে দেবে। এভাবে তুমি তার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। এবার আমার কাছে তার কথা ও ধরণ ভালো লাগল না। আমার দুশ্চিন্তা বাড়তে থাকল। আমি আবার তাকে বললাম, বেশি দূরে যেয়ো না। আমি বেশি সময় ঘরের বাইরে থাকতে পারব না। কিন্তু আমার কথার কোনো গুরুত্ব দিলো না। এদিক-সেদিক করে এড়িয়ে গেল।

হঠাৎ আমরা অন্ধকার একটি নির্জন স্থানে পৌঁছলাম। এটা কোনো রেস্ট হাউজ বলে মনে হলো।

এটা কোন জায়গা? আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো? বললাম।

গাড়ি থামল। এক লোক এসে দরজা খুলে দিলো। সেই লোক আমাকে বের করে একটি কামরায় নিয়ে গেল। সেখানে আগে থেকে দুইজন লোক ছিল। এক দিক থেকে সুগন্ধি বের হচ্ছিল। সবকিছু আমার কাছে বিদ্যুৎ চমকানোর মতো মনে হলো। আমি জোরে চিৎকার করতে থাকলাম। তাদের হাত থেকে রক্ষার আর্তনাদ জানালাম। কিন্তু তাদের অট্টহাসিতে মিশে গেল আমার সব আহাজারি।

অচেনা জায়গা। মনে প্রচণ্ড ভয়। আশপাশে কী পরিবেশ তার কিছুই টের পাইনি। হঠাৎ আমার চেহারায় একটি থাপ্পড় পড়ল। আমাকে মেরে ফেলার হুমকি দিলো। পরে যা হওয়ার তাই হলো। যখন আমার জ্ঞান ফিরল তখন দেখলাম আমি বিবস্ত্র। পরে তারা আমাকে চোখে কাপড় বেঁধে গাড়িতে তুলল এবং আমার বাসার কাছে এক জায়গায় এনে ফেলে রেখে গেল।

বিধ্বস্ত অবস্থায় ঘরে ফিরলাম। কাঁদতে কাঁদতে চোখ শুকিয়ে গেছে। আর কোনো পানি বের হচ্ছে না। আমার সন্তানদের দেখলাম, আমি চলে যাওয়ার পর তাদের মুখে কোনো খাবার পড়েনি। এখন আমার নিজের ওপরই নিজের

ঘৃণা আসছে। আত্মহত্যার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হই। সন্তানদের ব্যাপারেও কোনো দায়বোধ ছিল না।

আমার স্বামী সফর থেকে ফিরে এলো। আমার অবস্থা এতটাই খারাপ যে হাঁটতে পর্যন্ত পারছি না। সে আমাকে নিয়ে গেল হাসপাতালে। ডাক্তাররা আমাকে সাহস জুগালেন। মনোবল দৃঢ় করার পরামর্শ দিলেন। আমি আমার স্বামীকে আমার বাবার বাড়িতে পৌঁছে দেয়ার অনুরোধ করলাম। সে আমার এই অনুরোধ রাখল। বাবার বাড়ির লোকজন মনে করছে স্বামীর কোনো নির্যাতনে আমার এই অবস্থা। কিন্তু কী হয়েছে সেটা আমি আমার স্বামীকে যেমন খুলে বলতে পারিনি, তেমনি পারিনি পরিবারের কাউকে বলতে। এক পর্যায়ে আমার বাবা আমাকে স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দিতে চাইলেন। আমিও তালাকই চাইলাম। এটা স্বামীর কোনো দোষে না, আমি কোনো ভদ্রলোকের স্ত্রী হিসেবে থাকার যোগ্যতা হারিয়েছি এজন্য। আমি আমার নিজের পায়ে নিজেই কুড়াল মেরেছি।

চ্যাটিং দ্বারা যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠে সেই বন্ধুরা থাকে সুযোগের সন্ধানে। সুযোগ পেলেই সর্বস্ব লুটে নেয়। এক রাতেই তারা কারও জীবনকে অন্ধকার কবর বানিয়ে দেয়। আমার অবস্থা দেখে আমার স্বামী খুবই কষ্ট পেল। সে কয়েক দিন পর্যন্ত কোনো কাজে গেল না। আমি চাইলেও সে আমাকে তালাক দিতে অস্বীকৃতি জানাল। বেচারা আমাকে খুবই ভালোবাসত। সে আমাকে তালাক দিয়ে ঘর উজাড় করতে চাইল না।

আমি সেই ঘটনা নিজের মধ্যেই চেপে রাখলাম। কষ্ট আর ক্ষোভ মনেই পোষণ করলাম। কীভাবে তারা মানুষকে ফাঁদে ফেলে! একটি সাজানো সংসারকে তারা কীভাবে ধ্বংস করে দেয়। এই ইন্টারনেট কীভাবে একজন মানুষকে বিপথে ডেকে নিতে পারে! আমি চাই আমার মতো আর কোনো অবলা নারী যেন এমন ফাঁদে না পড়ে। আর কেউ যেন তাদের সাজানো সংসারে বিপদ ডেকে না আনে।

কুরআনের ভালোবাসা

এই কাহিনি বলেছেন আমাতুল্লাহ নামে একজন। তিনি বলেন, আমি মক্কার হারাম শরিফে ছিলাম। আমার ওপর নারীদের হজের প্রশিক্ষণ দেয়ার দায়িত্ব ছিল। আমি ছিলাম নারীদের তাঁবুতে। হঠাৎ এক নারী আমার কাঁধে হাত রাখলেন। তিনি ছিলেন অনারবি। ভাঙা ভাঙা আরবিতে কথা বলতেন। তিনি আমাকে বললেন, হে হাজ্জিয়া! হে হাজ্জিয়া!

আমি চেহারা ঘুরিয়ে তার দিকে তাকালাম। তিনি মধ্যবয়সী একজন নারী। আমার ধারণা মতে তিনি তুর্কি নাগরিক। তিনি আমাকে সালাম দিলেন। তিনি আমাকে কিছু বলতে চাচ্ছেন। কিন্তু তিনি ভাষায় প্রকাশ করতে পারছেন না। তিনি আমার হাত ধরে কুরআনে কারিমের দিকে ইশারা করলেন। পরে ভাঙা আরবিতে জিজ্ঞেস করলেন, কুরআন তেলাওয়াত করতে পারেন? আমি বললাম, হ্যাঁ পারি। তার চেহারায় খুশির আভা ফুটে উঠল। চোখ দিয়ে পানি ঝরতে থাকল।

তার এই অবস্থা দেখে আমারও কান্না চলে এলো। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কাঁদছেন কেন? তিনি মৃদু স্বরে বললেন, আমি কুরআন পড়তে জানি না। আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন? তিনি জবাবে বললেন, পবিত্র এই কিতাব পড়তে পারি না।

এখনও কথা শেষ হয়নি, এর মধ্যেই তিনি আবার কান্নায় ভেঙে পড়লেন। আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম এবং সাহস জুগালাম। আমি বললাম, আপনি এখন আল্লাহর ঘরে আছেন। তওয়াফের সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করুন যেন তিনি আপনাকে কুরআন বোঝার সামর্থ্য দান করেন এবং এই কাজ সহজ করে দেন। আমার এই কথা শুনে তার কান্না থামল।

এই ঘটনা আমি জীবনে ভুলতে পারিনি। ওই নারী সঙ্গে সঙ্গে হাত উঁচু করলেন এবং বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমার সিনা খুলে দিন। হে আল্লাহ! আমার মুখস্তশক্তি বাড়িয়ে দিন, যাতে আমি কুরআন পড়া শিখতে

পারি। হে আল্লাহ! আপনি আমার হৃদয় খুলে দিন, যাতে আমি কুরআন ধারণ করতে পারি।

তিনি আমার দিকে তাকালেন এবং চিন্তিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, আমি কি কুরআন শরিফ পড়া ছাড়াই মরে যাব! আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম; ইনশাআল্লাহ এমন হবে না। আপনি শিগগির কুরআন পড়তে সক্ষম হবেন।

আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি সুরা ফাতেহা পড়তে পারেন? তার চেহারায় খুশির ছাপ ফুটে উঠল। বললেন, হ্যাঁ। এরপর পড়া শুরু করলেন–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ...

তিনি সুরা ফাতেহা পুরোটা পড়লেন। পরে বসে গেলেন। ছোট ছোট সুরাগুলো পড়া শুরু করলেন। এগুলো তার মুখস্থ ছিল। আমি তার আরবি উচ্চারণ শুনে বিস্মিত হলাম। তিনি এমনিতে আরবি মোটামুটি ভালোভাবেই বলতে পারতেন। কিন্তু আফসোস প্রিয় ভাষাকে কুরআন শেখার জন্য ব্যবহার করেননি।

হঠাৎ তার চেহারার রঙ পাল্টে গেল। তিনি বলতে লাগলেন, আমি কুরআন পড়া না শিখে মরে গেলে জাহান্নামে যেতে হবে। আল্লাহর কসম! আমি কুরআনে কারিম তেলাওয়াতের ক্যাসেট কিনে নেব। এটা আল্লাহর কালাম। আর আল্লাহর কালাম সবচেয়ে মহান।

তিনি আল্লাহর মহত্ব ও বড়ত্ব বর্ণনা করতে থাকলেন এবং আমাদের ওপর আল্লাহর কিতাবের কী হক আছে তা বর্ণনা করতে লাগলেন। আমি তার কথাগুলো শুনে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছিলাম না। অনেক কাঁদলাম। একজন সাধারণ নারী আল্লাহর আজাবের এত ভয় পাচ্ছে! অথচ তিনি কুরআন পড়েননি। তার জীবনের শেষ বাসনা ছিল কুরআন পড়া শেখা। তিনি কাঁদতে থাকলেন। কান্নার কারণে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

তিনি কাঁদছেন কী কারণে? আল্লাহর কিতাব পড়তে পারেন না এই আক্ষেপে? আমাদের মধ্যে কি কখনও এই বোধ জন্মেছে? আমরা কি কখনও এই বিষয়টি ভেবেছি? আল্লাহ আমাদেরকে এই মহান অলৌকিক কালাম দিয়েছেন, অথচ আমরা এটা ভুলে আছি।

আল্লাহ আমাদেরকে সব সুযোগ দিয়েছেন কুরআন শরিফ তেলাওয়াত করা ও তা বোঝার। অথচ তা সত্ত্বেও আমরা এই কুরআনকে এড়িয়ে চলছি। কুরআনে কারিম ছাড়া আমাদের অন্তরে কীভাবে বিপ্লব জন্ম নেবে! আফসোস! শত আফসোস!

কে আমি? কী আমার পরিচয়?

গল্পটি বিস্ময়কর। ব্যক্তিটি একই সাথে জীবনের দুটি ভিন্ন অধ্যায় পার করেছে। যার একটি আলোকময়, অন্যটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। একটি হেদায়েতের নুরে উদ্ভাসিত, অন্যটি নষ্টামি আর ভ্রষ্টতায় ভরা। দুটি ভিন্ন অধ্যায়, ভিন্ন জীবন, ভিন্ন সময়।

অন্ধকারময় জীবনের অবসান ঘটিয়ে লোকটি এখন আলোকময় পরিচ্ছন্ন এক জীবন যাপন করছে। লোকটি তাঁর পরিবর্তনের গল্প নিজে আমাকে শুনিয়েছে। আমি তার নাম উল্লেখ ব্যতীত, শিক্ষণীয় ও হৃদয়স্পর্শী ঘটনাটি পাঠকের উদ্দেশে বলতে যাচ্ছি। কারণ, সে তাঁর শহরে এখন একজন পরিচিত মুখ। তাঁর পরহেজগারিতা, ইবাদত-বন্দেগির একনিষ্ঠতা, তেলাওয়াত ও কান্নাকাটির কথা লোকমুখে প্রসিদ্ধ।

পেশায় সে একজন সেনাবাহিনীর সদস্য। একটি শহরে খণ্ডকালীন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল সে। বন্দুক হাতে প্রহরায় লোকটি সে সময়টায় বেশ স্বাস্থ্যবান, সুঠাম দেহ ও ভরা যৌবনের অধিকারী ছিল। কিন্তু তার হৃদয় ছিল মৃত। মনোবলশূণ্য, ঈমানহীন নিরেট এক মানুষ।

আল্লাহকে সন্তুষ্টির উদ্দেশে জীবনে একটি সেজদাও সে করেনি। নামাজের মর্মই যে বুঝত না। নামাজ কী? নামাজের মূল্যই বা কী? আদৌ তা জানত না। যখন আশপাশের মানুষ তাকে নামাজের জন্য একটু আধটু জোর করতো, তখন নিরূপায় হয়ে মসজিদে যেত ঠিক, তবে তা ছিল নিতান্তই লোকদেখানো ও তাদের মনোতুষ্টির জন্য।

এককথায়, আল্লাহর দীন থেকে পূর্ণ বিমুখ হয়ে গিয়েছিল সে।

আল্লাহর বাণী—

أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿٢٣﴾

'আপনি কি তার প্রতি লক্ষ্য করেছেন, যে তার খেয়াল-খুশিকে স্বীয় উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করেছে? আল্লাহ্ জেনে শুনে তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন, তার কান ও অন্তরে মোহর এঁটে দিয়েছেন এবং তার চোখের ওপর রেখেছেন পর্দা। অতএব, আল্লাহর পর কে তাকে হেদায়েত দেবে? তবুও কি তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করবে না?' *[সূরা জাসিয়াত : আয়াত, ২৩]*

তার বিভ্রান্তির মাত্রা এতটা বেড়ে যায় যে, একপর্যায়ে ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে শুরু করে। সংশোধনের চিন্তা তার মাথায় আসত না। কোনো সৎব্যক্তিকেও সহ্য করতে পারত না। যখন তাকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করা হত, তৎক্ষণাত তা প্রত্যাখ্যান করে বলত 'নিজের চরকায় তেল দাও'।

নাপাকি লাগলেও পবিত্রতা অর্জনের ব্যাপারে কোনো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। অপবিত্র হলেও গোসল করত না, অজু করত না। অজুর পদ্ধতিও ছিল তার অজানা। এমনও অনেক হয়েছে, লোকজনের চাপে পড়ে নাপাকি নিয়েই মসজিদে নামাজ পড়তে গেছে। বিবেক যেন তার গভীর বিভ্রান্তিতে মজে ছিল। সে আচ্ছাদিত ছিল ভয়ংকর গোমরাহির চাদরে।

মানবিক অধঃপতনের সাথে সাথে তার চারিত্রিক পদস্খলনও ঘটেছিল। খেয়াল খুশীমতন জীবনযাপনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল সে। পাপের রাজ্যে হাবুডুবু খাওয়ার মতো অবস্থা। দুশ্চিন্তায় সিগারেট ছিল তার নিত্যসঙ্গী, হারাম দর্শনে চোখদ্বয় অভ্যস্ত আর গান-বাজনা, অশ্লীল বাক্যালাপে কান ছিল সরব। মোটকথা, নিজের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিরর্থক ও অশ্লীল কাজের জন্য অবমুক্ত করে দিয়েছিল পূর্ণমাত্রায়।

উৎসুক দৃষ্টি তার আশপাশে যুবতী নারী খুঁজে ফিরত। কাউকে পেলে তার পিছু নিত। একদল বখাটে যুবকের সাথে অশ্লীলতা, বেহায়াপনা আর হাসি-তামাশাকে সঙ্গী করে রাত কাটত তার। ঘুম পেলে ক্লান্ত দেহ মাটিতেই এলিয়ে দিত, জাগিয়ে না দেয়া পর্যন্ত ওভাবেই পড়ে রইত তার নিথর

শরীর—যেন একটা মৃত দেহ। উদভ্রান্তের মতো পাক পবিত্রহীন, নামাজ, কুরআন ও যিকিরবিহীন রাতের পর রাত কাটত—যেন সে পথহারা এক পথিক।

সুন্নাতের অনুসরণ তো বটেই, সুন্নাতের অনুসারীদের থেকেও গা বাঁচিয়ে চলত। দীনকে হাসি ঠাট্টার বিষয় জ্ঞান করত। দীনী বিষয়কে তার পশ্চাদপদতার কারণ বলে মনে হত। মনে করত, দীনী বিধানসমূহ নিতান্তই প্রাচীন রীতিনীতিসর্বস্ব, আধুনিকতা বলতে কিছু নেই। ধর্ম বিষয়টাই যেন তার কাছে বিরক্তির কারণ।

অকারণেই নেককার, সৎ, সুন্নাতের পাবন্দ দীনদার লোকদের সহ্য করতে পারত না। সে যেখানটায় থাকত, সেখান থেকে তিনশো মাইল দূরত্বে আপন সন্তানরা বাস করলেও তাদের সাথে কোনোরূপ যোগাযোগ রক্ষা করত না। নিজের সন্তানদের সাথেও সম্পর্ক বিচ্ছেদ করেছিল সে। যে ব্যক্তি স্বীয় স্রষ্টার সাথেই সম্পর্ক বিচ্ছেদ ঘটায়, তার জন্য মানুষের সাথে সম্পর্ক বিচ্ছেদ তো যুক্তিযুক্ত আর তা যেন খুব স্বাভাবিক ব্যাপার!

এভাবেই দিন-রাত, ঘণ্টা-মিনিট প্রতিটি অনুক্ষণ তার রঙ-তামাশা, অশ্লীলতা ও মোহাচ্ছন্নতায় অতিবাহিত হচ্ছিল। অন্ধকারময় জীবনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ যেন তা।

কিন্তু আল্লাহর কী মহিমা! তিনি এ অবস্থার পরিবর্তন চাইলেন। উক্ত শহরে একজন প্রভাবসম্পন্ন দাঈর আবির্ভাব ঘটল। যিনি ছিলেন একাধারে ইলম, আমল ও অনেক গুণের অধিকারী যোগ্য ব্যক্তি। যার দরদমাখা কথায় শ্রোতা গলে যেতে বাধ্য হত। আজও মানুষ যার কথা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে। তাকে স্মরণ করে অশ্রু নিবেদন করে। সেই আলেম ও দাঈ হলেন, মুহাম্মাদ বিন হামুদ ইয়ামানি। কয়েকবছর পূর্বে তিনি মারা যান। তিনি শুধু মুখের ভাষায় বলতেন না, কথার সাথে সাথে হৃদয়ের দরদ আর চোখের তপ্ত অশ্রু ঝড়ে পড়ত। মানুষ সহজেই প্রভাবিত হত সেই উষ্ণতায়।

এক নেককার ব্যক্তি তার স্বপ্নে দেখা একটি ঘটনা বর্ণনা করেন—আমি স্বপ্নে দেখলাম, একটি বাজার। লোকেরা সেখানে জমায়েত হয়েছে। সমাবেশস্থলের মধ্যখানে একজন ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বক্তব্য দিচ্ছিলেন। অনুমিত হলো—খোদ রাসূল ﷺ যেন কথা বলছেন। তাঁর বক্তৃতার প্রভাবে আমার বাবা-মাকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখলাম আর উপস্থিত অনেকেই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। পরে তাদেরকে পানির ছিটা দিয়ে জাগাতে হয়।

তিনি বলেন, পরদিন সকাল হলে দেখা গেল সত্যই লোকজন বাজারে জমায়েত হচ্ছে। তারপর সেখানে একজন ব্যক্তি উঁচুস্বরে দাঁড়িয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলেন, যার দরদমাখা কথার সাথে সাথে অশ্রুও সমানভাবে ঝড়ছিল। তার কথায় প্রভাবিত হয়ে একপর্যায়ে কিছু লোক খোলা ময়দানে মূর্ছা যায়। সংজ্ঞা ফিরিয়ে আনতে তাদেরকে পানির ছিটা দেয়া হয়। এটা ছিল তার পূর্ব দেখা স্বপ্নেরই বাস্তব রূপায়ন।

উক্ত ঘটনা এই দাঈ'র গ্রহণযোগ্যতার প্রমাণ বহন করে। একবার সেই দাঈ সৈন্যটির কর্মস্থল যে শহরে সেখানে সফরে যান। শহরের একটি ছোট মসজিদে প্রবেশ করেন তিনি। ঘটনাক্রমে মসজিদটি ছিল সৈন্যটির কর্মস্থলের পাশে এবং মসজিদের পাশেই সে বন্দুক হাতে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল।

নামাজ আদায়ের পর দাঈ লোকজনের সাথে কথা বলছিলেন, খবরাখবর নিচ্ছিলেন। অন্যের বাড়ি বাড়ি গিয়ে দাওয়াত দিচ্ছিলেন। লোকেরা তাঁর সাথে কথা বলে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ছিল। গুণমুগ্ধ সবাই তাঁর কাছে ভিড়তে লাগত। যেন নিজেদেরকে তাঁর জন্য উৎসর্গিত করে দেবে। পুরো ব্যাপারটি সৈনিক লক্ষ্য করছিল আর দাঈর কথাগুলো কান খাড়া করে শুনছিল।

তিনি কুরআনের এই আয়াতের ব্যাখ্যা করছিলেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَ لْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ وَ اتَّقُوا اللّٰهَ ۭ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ۝

> 'হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো; এবং প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা আগামীকালের জন্য সে কী অগ্রীম পাঠিয়েছে। আর তোমরা তাকওয়া অবলম্বন করো; তোমরা যা করো সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবগত।' *[সূরা হাশর, আয়াত-১৮]*

আখেরাতের আলোচনা করতে গিয়ে এর বাস্তবতা ও ভয়াবহতা স্মরণ করে তিনি কেঁদে ফেলেন। জান্নাত এবং জাহান্নাম সম্পর্কে বিস্তর আলোচনা করেন। সৈনিকটি হৃদয় দিয়ে দাঈর কথাগুলো শোনে এবং নিজেকে দাঈর প্রতি পূর্ণ মনোনিবেশ করে। আল্লাহর অনুগ্রহে সে তাঁর প্রতি ঝুঁকে পড়ে। সৈনিকটি আফসোসের সুরে নিজের ব্যাপারে বলে, হায়! আমি তো পথহারার ন্যায় জীবন যাপন করেছি। আমার প্রকৃত পরিচয় থেকে আমি বিস্মৃত হয়ে

পড়েছি, কে আমি? কী আমার পরিচয়? সে বলে, এসব ভাবতে ভাবতে আমি দাঁড়ানোর শক্তি হারিয়ে ফেলি এবং মাটিতে বসে পড়ি। আমার ভীষণ কান্না পায়—যে ব্যাপারে আল্লাহই অধিক অবগত।

দাঈ তাঁর স্বভাবগত নরম ভাষায় লোকটিকে ঈমান ও তাওহীদের প্রকৃতি তুলে ধরেন। আল্লাহর বাণী—

فِطْرَتَ اللّٰهِ الَّتِيْ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيْلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ۚ ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ ۙ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝

> 'এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম।' *[সূরা রুম, আয়াত ৩০]*

সৈনিক অতীতের ফেলে আসা অন্ধকার দিনগুলোকে স্মরণ করে। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আল্লাহর সামনে জবাবদিহিতার কথা ভেবে শঙ্কিত হয়। আল্লাহর বাণী,

يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُوْنَ لَا تَخْفٰى مِنْكُمْ خَافِيَةٌ

> 'সেদিন উপস্থিত করা হবে তোমাদেরকে আর তোমাদের কোনো কিছুই গোপন থাকবে না।' *[সূরা হাক্কাহ, আয়াত ১৮]*

এ সময় তার চৈতন্য ফিরে আসে। ঈমানী চেতনার জাগরণ মন ও অনুভূতিতে দোলা দিয়ে ওঠে।

সুবহানাল্লাহ, হৃদয়ের গভীরে যখন দীনের ভালোবাসা গেঁড়ে বসে, তবে তাকে পরাস্ত করে কে!

আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই, হৃদয়রাজ্যে যখন তাওহীদের রাজত্ব চলে তখন এরচেয়ে বড় বাস্তব বিষয় আর কী হতে পারে!

দাঈর কথা একসময় শেষ হলো। কিন্তু অনুতপ্ত এই পাপীর চোখ বেয়ে অনুশোচনার যে অশ্রু অঝোর ধারায় ঝড়ছিল তা শেষ হলো না। যেন কিছুতেই শেষ হবে না। এ যে শেষ হবারও নয়!

অস্বাভাবিক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ায় যখন সৈনিকটির মূর্ছা যাওয়ার অবস্থা, তখন সঙ্গীরা ছুটে এসে তাকে ধরে। উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করে, হে ভাই! কী হয়েছে তোমার? কীসে তোমায় আঘাত করল? শান্ত হও হে বন্ধু...

জবাবে সে শুধু অঝোরে কাঁদতে লাগল। কবি বলেন,

إذا اشتبكت دموع في خدود

تبين من بكى ممن تباكى

'চোখের অশ্রু যখন গাল বেয়ে নামে, প্রকৃত কান্নাকারী আর কান্নার ভানকারীর মধ্যকার পার্থক্য তখন সুস্পষ্ট হয়ে যায়।'

বন্ধুরা তার হাত থেকে বন্দুক তুলে নিলে সে তাদের পিঠে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ায়। আক্ষেপ আর বিলাপ করতে করতে নিজের ঘরে প্রবেশ করে। হঠাৎ বজ্রপাতের ন্যায় চিৎকার করে তওবার কথা ঘোষণা দিয়ে ওঠে। বলতে থাকে—আমি তওবা করছি..

হে আল্লাহ, আমি ক্ষমাপ্রার্থনা করছি..

হে রব, আপনার নিকট আমি আত্মসমর্পণ করলাম..

আপনি ক্ষমা করুন.. দয়া করুন হে রব!

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا ۚ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ

বলুন, 'হে আমার বান্দাগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি অবিচার করেছ, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ে যেও না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন। তিনি তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।' *[সূরা যুমার, আয়াত ৫৩]*

প্রথমেই সে গোসল করে পবিত্র হয় এবং পরিধেয় বস্ত্র খুলে সুন্দর পরিপাটি পবিত্র কাপড় পরিধান করে। এ যে নতুন জীবনের সূচনা। মাগরিবের নামাজ আদায়ের মাধ্যমে নতুন জীবনের ঈমানী অধ্যায়ের সূচনা করে সে।

আল্লাহর তাআলা বলেন,

أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

'যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তাকে আমি জীবিত করলাম, তার জন্য আলোর ব্যবস্থা করলাম যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলাফেরা করে, সে কি তার মতো যে অন্ধকারে নিমজ্জিত, যা থেকে সে কখনো বেরিয়ে আসতে পারবে না। এটা এজন্য যে, কাফেররা যা করছে তা তাদের জন্য চাকচিক্যময় করে দেয়া হয়েছে।' *[সূরা আনআম, আয়াত ১২২]*

নামাজ শেষে তওবা করে ফিরে আসা সৈনিকটি দাঈর সাথে মসজিদের পার্শ্ববর্তী একটি বাড়িতে যায়। সেখানে দাঈর অনুরক্ত ব্যক্তিবর্গরা হাজির হলে সবার উপস্থিতিতে আল্লাহর পথে ফিরে আসার ঘটনাটি শোনায়। গল্পটি জীবনের বাঁক পরিবর্তনের, নষ্ট জীবন থেকে ফিরে আসার—যে জীবন ছিল অতৃপ্তি আর হতাশার...

প্রজ্ঞাবান দাঈ মজলিসে তাকে হেদায়েতের পথনির্দেশ এবং সৌভাগ্যের পথ বাতলে দেন এবং ইসলামের মৌলিক বিষয়াবলী ও সুন্নাত আহকাম শিখিয়ে দেন। যে সম্পর্কে ইতিপূর্বে সে অজ্ঞ ছিল। এরপর তিনি উপস্থিত কয়েকজন ব্যক্তিকে তাকে আল্লাহর কালামের বিশুদ্ধ তেলাওয়াত, প্রয়োজনীয় সূরা মুখস্থকরণ ও কুরআনের আমল শিক্ষা দেয়ার জন্য নিযুক্ত করে দেন।

তওবাকারী সৈনিকটি তার অনুভূতি প্রকাশ করতে গিয়ে আমাকে বলেন, 'আল্লাহর কসম, আল্লাহর কাছে নিজেকে সঁপে দিয়ে ও হেদায়েতকে গ্রহণ করে আমি এতটা আনন্দ পেয়েছি যে, সে রাতে খুশির আতিশয্যে আমার একদম ঘুম পায়নি।'

أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ ۚ فَوَيْلٌ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

'আল্লাহ যার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, অতঃপর সে তার পালনকর্তার পক্ষ থেকে আগত আলোর

> মাঝে রয়েছে। (সে কি তার সমান, সে এরূপ নয়) যাদের হৃদয় আল্লাহর স্মরণের ব্যাপারে কঠিন হয়ে গেছে। তারা আছে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে।' *[সূরা যুমার, আয়াত ২২]*

তারপর থেকে অদ্যবধি সে ঈমানের ওপর অবিচল আছে ও ঈমানদীপ্ত জীবন অতিবাহিত করছে। আল্লাহর কসম, সে আমাকে বলেছে, 'আমি পবিত্র কুরআন হিফজ করেছি মাত্র চারমাসে।'

এখন কুরআনকে সঙ্গী করে সময় কাটে তার। সর্বাবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত করা তার অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। দিন-রাত মিলিয়ে মাত্র দু'ঘণ্টা ঘুমোয়। প্রতি তিনদিন অন্তর কুরআন খতম করে। নফল ইবাদতগুলোও গুরুত্বের সাথে আদায় করে। ফলে তার বাহ্যিক ও মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি হয়েছে। সমাপ্তি ঘটেছে দুঃখ-হতাশার। হাসিখুশি ও প্রফুল্লবদনে কথা বলে। বন্ধুভাবাপন্নতার ছাপ স্পষ্টই লক্ষ্য করা যায়। আল্লাহর অনুগ্রহে সে একজন বড় আবেদে পরিণত হয়েছে।

পাঠক, এতক্ষণ পর্যন্ত বলা কথাগুলো সেই ব্যক্তি থেকে আমি শুনেছি ও লিপিবদ্ধ করেছি। আমি জানি—অনেক পরিচিত ব্যক্তি ,তাকে চিনে থাকবেন। নিশ্চয়, এই ঘটনায় শিক্ষা রয়েছে, যারা আগ্রহচিত্তে শোনে অথবা হৃদয় দিয়ে অনুভব করে। (আল্লাহ তাওফিক দিন)। মহান আল্লাহ বলেন,

> ' رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا
> رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ
>
> 'হে আমাদের রব, নিশ্চয় আমরা এক আহ্বানকারীকে ঈমানের প্রতি আহ্বান করতে শুনেছিলাম যে, তোমরা স্বীয় রবের প্রতি ঈমান আনো; তাই আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের রব, আমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করুন এবং সকল দোষত্রুটি দূর করুন এবং আমাদেরকে পূণ্যবানদের সাথে মৃত্যু দান করুন।' *[সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯৩]*

আল্লাহর অনুগ্রহপ্রাপ্ত যুবক

একজন নির্ভরযোগ্য মুমিন দাঈ মারফত ঘটনাটি আমি শুনেছি। সে আমাকে একজন পথভ্রষ্ট যুবকের ঘটনা শোনায়—যে একসময় ধর্মবিমুখ ছিল এবং স্বীয় প্রতিপালককে ভুলে উদাসীনতায় মত্ত ছিল। ধর্মবিমুখ মানসিকতার সে যুবককে ঔদ্ধত্যের উদাহরণ হিসেবে পেশ করা হত। অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে অধিকাংশ মানুষ তার ধ্বংসের জন্য বদদোয়া করত, যেন মানুষ তার অনিষ্ট থেকে রেহায় পায়।

অনেকেই তাকে বুঝিয়েছে, কিন্তু সে পাত্তা দেয়নি। তাকে উপদেশ দিলেও তাতে কর্ণপাত করেনি। অনেক সতর্ক করলেও কাজ হয়নি। প্রবৃত্তির ঘোর অন্ধকারে ডুবে ছিল সে। একবার একজন আলেম তার সাথে সাক্ষাত করলেন। অনেকে সেই আলেমের কথায় প্রভাবিত হত। তিনি অবাধ্য যুবককে অনেক বোঝালেন, উপদেশ দিলেন। একপর্যায়ে ছেলেটির কান্নার উদ্রেক হয়। তিনি মনে মনে ধারণা করলেন, এবার বোধহয় ছেলেটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পথে ফিরে আসবে। কিন্তু সব চেষ্টাই নিষ্ফল প্রমাণিত হলো। যুবক পূর্বের অবস্থায় ফিরে গেল, যেন কোনো কথাই তার কানে ঢোকেনি!

মসজিদের সাথে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না; এমনকি জুমআর দিনও নয়। ইশার পর একদল নষ্ট প্রকৃতির বন্ধুদের সাথে ঘর থেকে বেরিয়ে যেত, রাত কাটিয়ে ফজরের সময় বাসায় ফিরে দিনভর ঘুমাত। কোনো কাজকর্ম বা চাকুরিও করত না। ফলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয়জগতে সে ছিল পুঁজিশূন্য। সন্তানের এহেন শোচনীয় অবস্থা দেখে তার মা খুব কান্নাকাটি করত বরং তার জন্য মৃত্যু কামনা করত। এমন সন্তান থাকার চেয়ে না থাকাই শ্রেয়।

এখানেই ক্ষান্ত নয়, যুবকটি গান-বাজনা শুনতে শুনতে ঘুমাত এবং তা শুনতে শুনতেই জেগে উঠত। বর্তমান শহুরে মানুষের ঈমানকে বিপর্যস্ত করে দেয়া

ধ্বংসাত্মক অশ্লীল ও চরিত্রবিধ্বংসী ছবি-ভিডিও তার কাছে থাকত। রীতিমতো মাদকদ্রব্য সেবন করত। তার মন ও মগজে ছিল নেশার আসক্তি।

অশ্লীলতা আর পাপাচারে লিপ্ত যুবকের আল্লাহর সাথে দূরত্ব বেড়েই চলছিল কিন্তু দয়াময় আল্লাহ ধৈর্যের চাদরে তাকে আবৃত রাখেন। ধৃষ্টতার পরিধি ব্যাপক হলেও আল্লাহ তাকে সুযোগ দিচ্ছিলেন। অবাধ্যতা ও পাপাচারের মাত্রা দীর্ঘ হলেও আল্লাহর অবারিত নিয়ামত থেকে তাকে বঞ্চিত করেননি।

অন্য সবকিছু শুনলেও সে কুরআন থেকে বিমুখ ছিল। কুরআন শুনত না, বুঝত না। অথচ দীনী বিষয় ব্যতীত সে সবকিছু বুঝত। আল্লাহর স্মরণ ও তৎসংশ্লিষ্ট সকল বিষয় ব্যতীত বাকি সব বিষয় তার কাছে প্রিয় ছিল।

আক্ষেপ—হৃদয় যখন আল্লাহর পরিচয় লাভে ব্যর্থ হয় তখন তা কতটা উচ্ছন্নে যায়!

আফসোস—অনুভূতি যখন লোপ পায়, মহামহিম আল্লাহ থেকে অন্তর কতটা বিমুখ হয়!

এভাবেই গুনাহ ও অবাধ্যতায় ধূলিমলিন অন্ধকারময় দিনগুলো তার অতিবাহিত হচ্ছিল। এ করুণ অবস্থা লক্ষ্য করে একজন নেককার দাঈ ব্যক্তি ভিন্ন কোনো পথ অবলম্বন করে এই গুনাহগারকে বাঁচানোর চিন্তা করেন। পূর্বের সকল পথ ও চেষ্টা যখন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে, তখন এবারের পন্থা নিশ্চয় হবে ভিন্নতর ও অভিনব। অনেক দাঈ, ইলমঅন্বেষী ও উপদেশদাতা উপদেশ দিতে যে পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, তা হলো, বিভিন্ন আলোচনা সম্বলিত ইসলামী ক্যাসেট উপহার দেয়া। সেগুলো মানুষের বাসা, বাড়ি, অফিস বা গাড়িতে ঢুকিয়ে দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিকে শুনতে উদ্বুদ্ধ করা। ক্যাসেটগুলোতে বিভিন্ন ইসলামী আলোচনা ও প্রভাবসম্পন্ন বক্তব্য ধারণ করা থাকত। ফলে শ্রোতা তা শুনে প্রভাবিত হত। তিনিও এই যুবককে বাছাইকৃত কার্যকর একসেট ক্যাসেট উপহার দিলেন। যুবকটি তা নিল বটে, কিন্তু সেগুলো শোনার ব্যাপারে তার কোনো আগ্রহ ছিল না। ওভাবেই সেটা গাড়িতে রেখে দিল।

একদিন সে সড়কপথে দাম্মাম শহরের উদ্দেশে সফর করছিল। রাস্তা দীর্ঘ হওয়ায় চলতি পথে গান-বাজনা শুনে সময় পার করছিল। একপর্যায়ে কৌতুহলের বশে একটি ইসলামী ক্যাসেট চালু করল; কীভাবে এসব মানুষ কথা বলে, কীইবা বলে? কথার ধরন কেমন—এসব শোনার উদ্দেশে।

যুবক খুব মনোযোগের সাথে ক্যাসেটের কথাগুলো শুনতে লাগল। তাতে আল্লাহর ভয় ও খোদাভীরুদের ঈমানদীপ্ত আলোচনা চলছিল। কথাগুলো তার হৃদয়ে গভীর রেখাপাত করল এবং খানিকটা বিহ্বলতায় একস্থানে স্থির হয়ে রইল সে। ক্যাসেটের আলোচনা শেষ হলে গভীর চিন্তায় পড়ে যায় যুবক। চিন্তাশক্তি রুদ্ধ হয়ে আসার উপক্রম হয়। মহান আল্লাহর সাথে নিজের কৃতকর্মের হিসাব মেলাতে শুরু করল সে।

এরই মধ্যে দ্বিতীয় ক্যাসেট শুরু হলো, এটা ছিল তওবা ও তওবাকারীবিষয়ক আলোচনার। যুবক আরও বেশি গভীর চিন্তায় ডুবে গেল তার দুঃখ ও হতাশাময় অতীতের কথা চিন্তা করে। যে জীবন শুধু আল্লাহর অবাধ্যতায় কাটিয়েছে। সে কথা চিন্তা করে কান্না ছাড়া তার আর কোনো গত্যন্তর ছিল না। ক্যাসেট একের পর এক চলছিল এবং চেতনা জাগানিয়া এসব কথার প্রভাবে তার কান্নাও অব্যাহত ছিল।

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ

‘হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ডাকে সাড়া দাও, যখন তোমাদের জীবন সঞ্চারক বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। *[সূরা আনফাল, আয়াত ২৪]*

দেখতে দেখতে দাম্মাম শহরের কাছাকাছি চলে আসে, কিন্তু অতিমাত্রার চিন্তা ও প্রভাবিত হওয়ার দরুন গাড়ি চালানোর মতন অবস্থা যুবকের ছিল না। তার দেহ ও মনে তখন ঈমানের ঢেউ খেলছিল, যে ঢেউ তাকে বারবার নাড়িয়ে দিচ্ছিল। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ ۚ صُنْعَ اللَّهِ الَّذِي أَتْقَنَ كُلَّ شَيْءٍ

‘তুমি পর্বতমালাকে দেখে যদিও অচল বলে ধারণা করো, কিন্তু সেগুলোও একদিন মেঘমালার ন্যায় সচল হবে। এসব আল্লাহর সৃষ্টি আর তিনি সবকিছুকে যথাযথ করেছেন।’ *[সূরা নামল, আয়াত ৮৮]*

সে শহরে পৌছে প্রথমেই ঈমানের শহরে প্রবেশ করল। জীবনের মোড় পাল্টে গেছে তার। জীবন সম্পর্কে বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বের অবাধ্য ও অস্বীকারকারীর দৃষ্টিভঙ্গির জায়গায় এখন অনুগত বান্দার দৃষ্টিভঙ্গি জায়গা করে নিয়েছে।

প্রথমেই মসজিদে প্রবেশ করে অজু করে। অজুর পানির সাথে চোখের পানি একাকার হয়ে যায় সবার দৃষ্টির অগোচরে।

মসজিদে ঢুকে নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে ঈমানী জীবনের সূচনা করে, এ এক নতুন জীবন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

'বলে দিন, সত্য এসেছে ও মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চিত মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।' *[সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত ৮১]*

সে পরিবারের কাছে ফিরে আসে। তবে পূর্বের যে অবস্থায় বেরিয়েছিল সে অবস্থায় নয়। পূর্বে বেরিয়েছিল গুনাহগার, অবাধ্য আর পাপাচারী হয়ে আর এবারে সে ফিরেছে গুনাহমুক্ত আনুগত্যের চিত্তে। তওবা, আনুগত্য ও আত্মসপর্মনের নুরে আলোকিত হয়ে। পূর্বের অবস্থা আর পরের অবস্থার মাঝে এক বিস্তর ফারাক।

আকস্মিক এ পরিবর্তনে পরিবারের সদস্যরা বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করে, কী এমন ঘটলো হে? কীইবা হয়েছে তোমার? হঠাৎ এমন পরিবর্তন!

যুবকটি উত্তরে বলে- 'সত্যিই আমার জীবনে অনেক বড় কিছু ঘটে গেছে। আমি আমার জীবনের ভুল বুঝতে পেরে আল্লাহর পথে ফিরে এসেছি, আল্লাহর নিকট তওবা করেছি। সঠিক পথের দিশা পেয়ে গেছি।'

একথা বলছিল আর তার চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল। এ অশ্রুতে আনন্দ মিশে ছিল। কিছু অশ্রু তো আছে যা আনন্দের অশ্রু!

বাড়িতে আনন্দের রোল পড়ে যায়। যুবকের পরিবর্তনে সবাই খুব খুশী। লোকদের মাঝেও খবরটি ছড়িয়ে পড়ে। সকলেই আনন্দিত হয় আল্লাহর পথে তার ফিরে আসায়, তার জন্য দু'আ করতে থাকে। আল্লাহর বাণী,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ ۖ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ

'আর এরাই ওরা, যাদের সৎ আমলগুলো আমি কবুল করি ও মন্দকর্মগুলো মার্জনা করি, তারা জান্নাতের অধিবাসী হবে। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে তা সত্য প্রতিশ্রুতি।' *[সূরা আহক্বাফ, আয়াত ১৬]*

আল্লাহ তাআলা আরও বলেন, 'হে আদম সন্তান, যতক্ষণ আমাকে ডাকতে থাকবে এবং আমার কাছে চাইতে থাকবে ততক্ষণ আমি তোমার গুনাহ ক্ষমা করতে থাকবো, গুনাহর পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন এ ব্যাপারে আমি ভ্রুক্ষেপ করি না। হে আদম সন্তান! যদিও তোমার গুনাহ আকাশসম হয়, অতঃপর আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো আমি তোমাকে ক্ষমা করে দেব। এ ব্যাপারে আমি কোনো পরোয়া করি না। হে আদম সন্তান! যদি পৃথিবী সমান গুনাহ নিয়েও আমার কাছে হাজির হও আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করে থাকো তবে আমি পৃথিবীর সমান ক্ষমা নিয়েই তোমার কাছে এগিয়ে যাব।' *(আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত হাদীসে কুদসী, সহীহ তিরমিযি।)*

স্ত্রীর পরশে ধন্য স্বামী

এখন আমি সেনাবাহিনীর এক সদস্যের ঘটনা উপস্থাপন করতে যাচ্ছি। বর্ণিত সত্য ঘটনাটি তাদের এক সদস্যের সাথে আমার থাকাকালীন সময়ের।

এই ব্যক্তি আমোদ প্রমোদ বা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশে দেশ বিদেশ সফর করত এবং ঘরে বাইরে সর্বত্র পাপকর্মে লিপ্ত থাকত। লোকচক্ষুর পরোয়া না করে প্রকাশ্যে অপ্রকাশ্যে, রাত্র দিন আল্লাহর নাফরমানি করত।

অতিমাত্রার স্বাদ আহ্লাদ ও অন্ধকারে মজে থাকার দরুন তার কাছে জীবনের অর্থই হয়ে দাঁড়ায়; নারী ও মদের পেয়ালা। নিজেকে দূর্ভোগ ও করুণ পরিণতির আঁস্তাকুড়ে নিক্ষেপ করেছিল সে।

একবার সে ফ্রান্সের মতো নির্লজ্জ ও জঘন্য রাষ্ট্রে গমন করে। সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে সে সময়টায় চতুষ্পদ প্রাণীতুল্য জীবন যাপন করে। কতিপয় প্রাণীও যে জীবনকে অবজ্ঞাভরে প্রত্যাখান করে এবং একমাত্র আল্লাহর ঘোর শত্রুরাই এমন জীবন কাটায়। কুরআনের ভাষায়,

اَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا

'ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের চেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তাদের ধারণা, তারাই সৎকর্ম করছে।' *[সূরা কাহফ, আয়াত-১০৪]*

সেখানে কিছুদিন অবস্থান করে সে পুনরায় স্বদেশে ফিরে আসে কিন্তু ততদিনে সে পাশ্চাত্যের কৃষ্টি কালচার রপ্ত করে এবং তাতে তার মন মস্তিষ্ক পুরোপুরি প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তার কাছে সম্মানের মানদণ্ড হয়ে দাঁড়ায় পাশ্চাত্যের কথিত সুশীল শ্রেণী। আদবকেতা ও ভদ্রতা বলতে শুধু পাশ্চাত্যের রীতিনীতি বোঝে। যেন চারদিকে শুধুই পাশ্চাত্যের কালচার।

এ অবস্থায় সে বিবাহ করে। সৌভাগ্যক্রমে স্ত্রী ছিল সতী সাধবী নারী। আল্লাহর পরিচয় লাভ করা মহীয়সী স্ত্রী। মহান আল্লাহ তাআলা বলেন,

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা চক্ষুদ্বয়ের শীতলতা হবে।' *[সূরা ফুরকান, আয়াত ৭৪]*

কুরআনে বর্ণিত 'চক্ষুর শীতলতা'র ন্যায় এই স্ত্রীও প্রকৃতপক্ষে ছিল চক্ষুর শীতলতা বা চোখ জুড়ানোর কারণ। সে পূর্ণ ইসলামী অনুশাসন মেনে চলা ও ঈমানের সংশ্রবপ্রাপ্ত পরিবারে বেড়ে ওঠা মেয়ে। পরিবারের সবাই নামাজ, জিকির ও সত্যবাদিতায় পাবন্দ। নারীদের পর্দা, শালীনতা ও সচ্চরিত্রের ব্যাপারে গুরুত্বারোপকারী পরিবার। যে পরিবারে কোনোদিন গান-বাজনার চর্চা হয়নি এবং কখনো অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও চরিত্র বিধ্বংসী ছবির অনুপ্রবেশ ঘটেনি। এমনই এক পরিবারের আদর্শ ও সৎ মেয়ে সে।

স্বামী স্ত্রী মিলে নতুন জীবনের সূচনা করে তারা। নিজ স্বামীকে আল্লাহর দিকে আগ্রহী করে তোলার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করতে থাকে স্ত্রী। যখনই সুযোগ পেত স্বামীর সাথে ঈমান ও হেদায়েতের বিষয়ে কথা বলত। স্বামীও লক্ষ্য করে, তার স্ত্রী একজন প্রকৃতই আবেদা নারী, নামাজী ও জিকিরকারী। ঘরে প্রবেশকালে আল্লাহর নাম নেয়, খাবার প্রস্তুত করে আল্লাহর নামে। সকল কাজ আল্লাহর প্রশংসার মাধ্যমে শেষ করে। সে স্বামীকে প্রতিনিয়ত নাজাতের পথে আহ্বান করতে থাকে এবং তার জন্য দুআ করতে থাকে।

একসময় স্ত্রীর অনুরোধে স্বামী নামাজ আদায় করা শুরু করে তবে মসজিদে না গিয়ে বাড়িতে পড়তে থাকে। এটি ছিল পরিবর্তনের প্রথম ধাপ। যার সুফল ছিল অব্যর্থ। এরপর স্ত্রী তাকে জামাআতের ফজিলত বর্ণনা করে শোনাতে শুরু করে এবং সহানুভূতির সাথে নরম ভাষায় উপদেশ দেয়। ফলে সে মাঝেমধ্যে মসজিদে গিয়েও নামাজ আদায় করতে শুরু করে। এটা ছিল পরিবর্তনের দ্বিতীয় ধাপ।

প্রথম যেদিন মসজিদে হাজির হয়, সেটি ছিল ফজরের নামাজ। ফজরের জামাআতের মাধ্যমে তার জামাআতে নামাজ আদায়ের সূচনা ঘটে। সেটি ছিল দীর্ঘ ঈমানী প্রত্যাশার ফল। এরপর থেকে প্রতি ওয়াক্তেই মসজিদে গিয়ে নামাজ আদায় করে এবং নেশা করাও এক পর্যায়ে ছেড়ে দেয়। স্ত্রী

তাকে অসৎ বন্ধুদের সঙ্গ ছাড়ার ব্যাপারে জোর দেয় এবং সৎ বন্ধুদের সাহচর্য নিতে আগ্রহী করে তোলে। ফলে স্বামী আল্লাহবিমুখ মানসিকতার বন্ধুদের সঙ্গ ত্যাগ করে।

একদিন স্ত্রী তাকে একটি কুরআন উপহার দেয়। সে উপহার পেয়ে স্বামী ভীষণ আনন্দিত হয় এবং সেটা নিয়মিত তেলাওয়াত করতে শুরু করে। এরপর স্বামী ধুমপান ছেড়ে দেয়। দাড়ি দীর্ঘ করে এবং বড় ও ঢিলেঢালা পোশাক পরতে শুরু করে। এভাবেই পূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্বে পরিণত হয় সে। ঈমানের নূরে আলোকিত হয়ে ওঠে। বিভিন্ন ইলমী মজলিসে, সৎলোকের মজমায় ও ঈমানী বৈঠকে নিয়মিত উপস্থিত হওয়া শুরু করে। সৎলোকদের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং তারাও তার সাথে সাক্ষাৎ করে। ইতোমধ্যে সে হজ্জ ও ওমরাহ আদায় করেছে। আল্লাহর প্রশংসা যে সে সকল গান-বাজনা, অশ্লীল পত্র-পত্রিকা ও চরিত্র বিধ্বংসী ছবি পরিহার করেছে। কুরআনের ভাষায়,

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ

> 'সুতরাং আল্লাহ যাকে হেদায়েত দিতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্য উন্মুখ করে দেন।' *[সূরা আনআম, আয়াত ১২৫]*

এখন সে সমৃদ্ধ ইসলামী জীবন কাটচ্ছে ও হৃদয় যার রবের প্রতি শুকরিয়াকাতর। জিহ্বা এখন সর্বদা স্বীয় পালনকর্তার জিকিরে সিক্ত থাকে। কুরআনের অনেকখানি অংশ মুখস্থ করেছে। এখন সে যেন একজন সত্যবাদী মুমিনের জ্বলন্ত প্রতিচ্ছবি।

শান্তি বর্ষিত হোক ওই নেক স্ত্রীর প্রতি। আল্লাহ তাআলা তার মর্যাদা বাড়িয়ে দিন এবং নারীদের মধ্য থেকে তার ন্যায় আরও নারী বের করুন। শান্তি বর্ষিত হোক উক্ত স্বামীর ওপরও। আল্লাহ তার হৃদয়কে সুদৃঢ় করুন। পুরুষদের মধ্যে তার ন্যায় পুরুষ বাড়িয়ে দিন। অগ্র ও পশ্চাতের সকল ফয়সালা তো শুধুমাত্র আল্লাহর। হাদীসে এসেছে,

> 'হে বান্দাসকল, তোমরা রাত্র-দিন গুনাহ করো আর আমি তোমাদের সকল গুনাহ চাইলেই মার্জনা করি। সুতরাং আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো, তোমাদের গুনাহ মার্জনা করে দেব।' *[হাদীসে কুদসী, আবু যর রাযি. থেকে ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত]*

হেজাজের তওবাকারী

যখন আমি এই ঘটনাসম্বলিত বইটি লেখার ইচ্ছাপোষণ করলাম, তখন আমার নিকটতম মানুষদের অথবা অন্যদের তওবা সম্পর্কিত উৎসাহব্যঞ্জক ঘটনা তালাশ করি। এরই মধ্যে ওহী অবতরণস্থল (মক্কা) থেকে আমার নিকট একজনের ফোন আসে এবং তার সাথে আমার কথা হয়।

সে ছিল এক যুবক; নির্জনবাসের ইতি টেনে যে আল্লাহর পথে ফিরে এসেছিলো। অসভ্য জীবনের অধ্যায় চুকিয়ে নতুন জীবনের সূচনা করেছিল ও অবিশ্বাসের পর পূর্ণ বিশ্বাসী হয়ে উঠেছিল। সে আমাকে তার জীবনকাহিনী খুলে বলে।

প্রশংসা ওই মহান সত্তার, যিনি পথহারাকে হেদায়েত দেন; ফলে সে আত্মোৎসর্গকারী মুজাহিদে পরিণত হয়। ঔদ্ধত্যকে পরিণত করে দেন ইবাদতগুজার বান্দায়। পথভ্রষ্ট পাপীকে পরিণত করেন তাঁর পথে আহ্বানকারী দাঈতে। যেমনটি আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكٰى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ

> 'যদি আল্লাহর অনুগ্রহ আর দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন পবিত্র করেন।' *[সূরা নূর, আয়াত ২১]*

নিজের বর্ণনা অনুযায়ী ভ্রষ্টতার গভীর ঘুমে নিমজ্জিত ছিল সে। এমন কিছু বাজে বন্ধুবান্ধব ছিল তার যারা সবরকম পাপ ও অশালীন কাজে তাকে প্ররোচিত করত। দীর্ঘ সময় পড়াশোনা থেকে দূরে ছিল। তার একটি গিটার সাদৃশ বাদ্যযন্ত্র ছিল। তাতে সে অনর্থক ও অশ্লীল গানের সুর তুলত। কিন্তু সে হয়ত জানত না, শীঘ্রই তার হৃদয়েই ঈমানী সুরের অনুরণ বেজে উঠবে এবং সে নুরের জ্যোতির্ময় আলোকচ্ছটায় আলোকিত হবে হৃদয়। সে খুব মিষ্টি গলার অধিকারী ছিল। তবে সে গলায় শুধু গান করত। অচিরেই সেটি

কুরআনের সুমিষ্ট আওয়াজে আরও সুন্দরতর হয়ে ওঠল। সে নেশায় আসক্ত ছিল ও বিভিন্ন প্রকার মাদকদ্রব্য সেবন করত। নামাজের মতো গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত বিনষ্ট করত। বিভিন্ন অশ্লীল ছবি নিজের কাছে সংরক্ষণ করত। আল্লাহ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া ব্যক্তির হৃদয়ে তাঁর ভয় কখনো স্থান পায় না। ঈমান থেকে পলায়নকারীর দৃষ্টিশক্তি থাকাসত্ত্বেও প্রকৃত তা অন্ধকারাচ্ছন্ন। কর্মহীন, উপার্জনক্ষম ও পড়াশুনায় অকার্যকর অধিকাংশ হতোদ্যম ব্যক্তিরাই পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়। কথায় আছে, 'অলস মস্তিষ্কে শয়তানের বাসা।' কুরআনে এসেছে,

وَمَنْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ

'আর আল্লাহ যাকে জ্যোতি দান করেন না তার জন্য কোনো জ্যোতি নেই।' *[সূরা নুর, আয়াত ৪০]*

কিন্তু হেদায়েতের চাবিকাঠি তো একমাত্র আল্লাহর কাছেই। যা দ্বারা তিনি যখন যাকে ইচ্ছা তার হৃদয়কে হেদায়েতের জন্য উন্মুক্ত করে দেন। হেদায়েতের উপলক্ষ্য কখনো হতে পারে সামান্য কথা, কারও সাধারণ মন্তব্য কিংবা কোনো বিষয়ে গভীর দৃষ্টিপাত, কারও হিতোপদেশ, হৃদয়স্পর্শী দৃশ্য অবলোকন অথবা শেষ পরিণতি সম্বন্ধে গভীর চিন্তা-ভাবনা। ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রাতি অথবা যে কোনো উপলক্ষ্য দিয়ে আল্লাহ তাআলা পছন্দসই ব্যক্তিকে হেদায়েত দিয়ে থাকেন।

তেমনি এই যুবক ভাইটির পরিবর্তনও হুট করেই ঘটেনি বরং ধীরে ধীরে সে অগ্রসর হয়েছে এবং একটু একটু করে তার মধ্যে পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এক সময় তা পূর্ণতায় পৌছে, এরপর পূর্ণতা থেকে তা আরও পুষ্ট ও দৃঢ় হয়। অতঃপর যেন তা ঈমানী কাণ্ডের ওপর শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যায়।

সে অবাধ্য প্রকৃতির আর অশ্লীলতায় ডুবে থাকলেও তার চেহারায় উৎফুল্লতার ছাপ শোভা পেত এবং নীতিতে একনিষ্ঠ ছিল। যে কেউ তার সাথে কথা বলতে পারত এবং অন্যের কথা সে মনোযোগ সহকারে শুনত। আর এটিই ছিল দাঈদের জন্য মোক্ষম সুযোগ। অন্যথা তারা যখন কোনো পাপী, কঠিন ও বদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী কারও কাছে দাওয়াত পেশ কওে, আর তারা যদি সে ব্যাপারে অনাগ্রহী হয়, তবে তার সাথে খোলামেলা আচরণ করা সম্ভব হয় না।

কিন্তু এই তওবাকারী যুবকটি ব্যতিক্রম। তার সাথে কিছু যুবকের সার্বক্ষণিক সাক্ষাতের অনুমতি ছিল, যারা খুব প্রজ্ঞাবান ও উত্তম চরিত্রের অধিকারী ছিল। প্রথমদিকে তারা কৌশল অবলম্বন করে। তারা যখন যুবকটির বাসায়

যেত তখন কিছুটা নীরবতা অবলম্বন করত এবং নিজেরা আগ বাড়িয়ে কোনো কথা শুরু করত না। সাময়িক সে সাক্ষাতে হাসিঠাট্টা ও সাধারণ কথাবার্তা হত, যাতে পরবর্তী আরও সাক্ষাতের সুযোগ লাভ করা যায়। তারাও যুবকটিকে তাদের সাথে সাক্ষাতের অনুরোধ করে এবং সে তাতে সম্মত হয়। এভাবে তাদের পরস্পরের মাঝে হৃদ্যতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এ সুযোগে যুবকগুলো তাকে হেদায়েতের নানা কথা শোনায় এবং কিছু ইসলামী বই ও ক্যাসেট উপহার দেয়।

ফলে যুবকটি এক সময় নামাজ পড়া শুরু করে এবং জামা'য়াতে নামাজ আদায়ের ব্যাপারে যত্নবান হয়। এভাবে ধীরে ধীরে তার অবস্থার উন্নতি ঘটতে থাকে এবং নবী ﷺ-এর সুন্নাত অনুসরণের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

আল্লাহর বাণী-

وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ

'যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত হয়েছে, তাদের হেদায়েতপ্রাপ্তি আরও বেড়ে যায় এবং আল্লাহ তাদেরকে তাকওয়া দান করেন।'
[সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত ১৭]

হেদায়েতের নিয়ামতে ধন্য যুবক এখন বিশুদ্ধ জীবন অতিবাহিত করছে। আল্লাহর রাস্তায় প্রহরায় তার মর্যাদা বাড়িয়ে তুলেছে। আল্লাহর দীন হেফাজতের অমীয় স্বাদ সে অনুভব করেছে এবং কল্যাণ থেকে কল্যাণতর পথে এগিয়ে চলছে।

আল্লাহ আমাদেরকে ও তাকে হকের ওপর অবিচল রেখে তার দিদার লাভ করান। (আমিন) কবির ভাষায়, 'হে লজ্জার অশ্রু, তুমি কতই না খাঁটি! হে আক্ষেপের দীর্ঘশ্বাস, কতই না উষ্ণ তুমি! অনুগত বান্দার সত্য গ্রহণ, কতই না সুমিষ্টতা! আর তওবাকারীর প্রভাত, তা কতই না উজ্জ্বল!'

তওবাকারী কবি[১]

ইসলামী সাহিত্যের ইতিহাসে শোকার্ততার সাথে যার নাম আলোচিত হয় এই ঘটনাটি সেই মহান মুজাহিদ কবির। ঘটনাটি বেশ চমকপ্রদ। তওবাপূর্ব জীবনে যে উদভ্রান্ত ও দূর্ভাগ্যের জীবন যাপন করে। জীবন ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সে সম্পূর্ণ উদাসীন ছিল। পাপাচারিতায় লিপ্ত একদল সঙ্গীর সাথে উঠাবসা করত যারা চুরি, লুটপাট, ছিনতাইয়ের জন্য ওঁৎ পেতে থাকত। কোনো পথচারী তাদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পেত না। আকস্মিক আক্রমণ, চুরি ও হত্যায় জড়িত ছিল সবাই। কোনো কাফেলার পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে তাদের আক্রমণ থেকে কাফেলার মুক্তি ছিল অসম্ভব। রাত কাঁত অনর্থক, অনিষ্টকর। দিন কাটত ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থেকে। হৃদয় যখন আল্লাহর পথ থেকে দূরে সরে যায়, তখন তা অন্ধত্ব বরণ করে এবং ভ্রষ্টতার স্বীকার হয়।

দীর্ঘ সময় এভাবেই নানা অপকর্মে লোকটির কেটে যায়। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো, এমন অবাধ্য ও বিশৃঙ্খল জীবন কাটলেও সে আল্লাহর ক্ষমার আশা থেকে নিরাশ ছিল না। আর কেনই বা নিরাশ হবে, একমাত্র অবিশ্বাসী কাফেররাই আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ।

এক সুন্দর দিনে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে লোকটির শুদ্ধ চেতনার উন্মেষ ঘটে। মানুষ প্রথম জন্মকালে যেমন পবিত্র ও পঙ্কীলহীন থাকে তেমন একটি দিন, সে দিনটি হলো তওবার দিন। পরমাত্মীয়ের কাছে ফিরে আসার দিন।

এই ব্যক্তিটি সেদিন আল্লাহর পথে জিহাদ করতে চলা এক সৈন্যদলের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিল। কাফেলার নেতৃত্বে ছিল সাঈদ ইবনে উসমান ইবনে আফফান রাযি.। লোকটি স্বচক্ষে এমন যুবকদের প্রত্যক্ষ করল যারা নিজেদেরকে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়েছে, আর বিনিময়ে আল্লাহ তাদেরকে

---

[১] মালিক ইবনে রয়্যিব। ২১ হিজরীতে সালে বনু তামীম গোত্রে জন্মগ্রহণ করেন। হিজরী প্রথম শতকের উল্লেখযোগ্য একজন কবি কিন্তু ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন হৃদয়স্পর্শী তওবার ঘটনার মধ্য দিয়ে। তিনি দক্ষ ঘোরসওয়ার ও দুঃসাহসী ছিলেন। উসমান রা.-এর পুত্রের হাত ধরে হেদায়েতলাভ করেন। মৃত্যুঃ ৫১ হিজরী।

জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। যুবকগুলো শত্রু বাহিনীর নিকট গিয়ে তাদেরকে অস্ত্রমুক্ত করে এবং মূল্য আদায় করে। যুবকদের চেহারায় স্বীয় রবের আনুগত্যের নুর এবং ইবাদতের দ্যুতি প্রকাশ পাচ্ছিল।

পাপী ব্যক্তিটি নিজের জীবনের ব্যাপারে গভীর চিন্তায় পড়ে গেল। আল্লাহর জন্য নিবেদিত এসব যুবকের সাথে নিজেকে তুলনা করতে শুরু করল।

তার রাত কাটে গান বাজনা, হাসি তামাশা ও ফূর্তি করে। আর তাদের রাত কাটে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি, দুআ ও অশ্রু ঝড়িয়ে। তার দিন অতিবাহিত হয় লুটপাট, ছিনতাই ও ঔদ্ধত্যপনায় অথচ তাদের দিন অতিবাহিত হয় আল্লাহর পথে জিহাদ, কুরবানী ও দাওয়াতের কাজে। হৃদয় তার প্রবৃত্তির প্ররোচনা ও ভোগ বিলাসের সায়রে হাবুডুবু খাচ্ছিল। অথচ তাদের পরিচ্ছন্ন হৃদয়গুলো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসায় পূর্ণ, কুরআন ও সুন্নাহর নুরে আলোকিত। হায়, উভয়ের জীবন পদ্ধতিতে কত তফাৎ, কত ফারাক!

* প্রকৃত নিঃস্ব তারাই, যারা জীবনকে নিছক কাঁচের পেয়ালা, গানবাজনায় মত্ত আমোদ ফূর্তি ও জুলুমবাজির মনে করে।

* প্রকৃত হতদরিদ্র তারাই, যারা সময়কে অযথা খেল-তামাশা আর মজায় উড়িয়ে দেয়।

* প্রকৃত অসহায় তারাই, যারা সৌভাগ্য বলতে শুধু পানাহারে উদরপূর্তি আর আরাম আয়েশ ভাবে। আল্লাহর বাণী,

قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ

'বলুন, আল্লাহর এই দান ও রহমতের প্রতি সকলেরই আনন্দিত হওয়া উচিত। তাদের সঞ্চিত সম্পদের চেয়ে তা বহু উত্তম।' *[সূরা ইউনুস, আয়াত ৫৮]*

এসব ভাবতে ভাবতেই লোকটির চৈতন্য ফিরে আসে। হৃদয়ে খোদা তাআলার নুর জায়গা করে নেয় । সে এগিয়ে যায় দলনেতার প্রতি, তাঁর হাতে হাত রেখে দীপ্তকণ্ঠে তওবার ঘোষণা দেয়, আল্লাহর পথে ফিরে আসার কথা জানিয়ে দেয় সবাইকে। তার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছে এবং চক্ষুদ্বয় হক প্রত্যক্ষ করেছে।

অতঃপর সে নিজেকে স্বীয় রবের কাছে সমর্পন করে দেয় এবং দলটির সাথে আল্লাহর পথে বিজয়ী বেশে সফর করতে থাকে। নিজেকে পুরোপুরি আল্লাহর নিকট সঁপে দেয়। নিশ্চয় সে সরল পথপ্রাপ্ত হয়েছে আর আল্লাহ সত্যই বলেছেন-

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

'যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো। নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছেন।' *[সূরা আনকাবুত, আয়াত ৬৯]*

পরের ঘটনা হলো, একবার সে আল্লাহর পথে জিহাদরত অবস্থায় এক বিষধর সাপ তাকে দংশন করে। একপর্যায়ে শরীরে কম্পন সৃষ্টি হয় এবং অনুভব করে তার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। অবস্থার অবনতি ঘটলে আশঙ্কা করে, এ জীবন ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে। অতীতের ফেলে আসা অন্ধকারময় দিনগুলোর কথা স্মরণ করে হতাশ হয়ে পড়ে তবে তওবার কথা ভেবে সান্ত্বনা পায়। কাছের মানুষদের কথা তার মনে পড়ে; মা-বাবা, ভাই-বোন, স্ত্রী, শৈশবের খেলার সাথী সবার কথা ভেবে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং একটি কবিতা আবৃত্তি করে। করুণ সুরে আওড়ানো কবিতার পংক্তিগুলো এমন ছিল যে, ইতোপূর্বে কোনো কবি যা শোনেনি। যাদুময়ী কবিতাটিতে দুঃখ-কষ্ট ও শোক-যন্ত্রণার মিশেলে কবির তওবার ঘোষণা ও আল্লাহর পথে ফিরে আসার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা ছিল।

সুসময়ের তওবা

সৌদি আরবের আবহার বাসিন্দা এই যুবকের ঘটনাটি এক পরিচিত দাঈ আমায় শুনিয়েছেন। সুঠাম ও বৃহৎ শারীরিক গঠনের যুবকটিকে পরিচিতজনদের অনেকেই চেনে। প্রাইমারীতে পড়াকালেই সে চরম দুষ্টু প্রকৃতির ছিল। চেয়ার টেবিল ওলট পালট করে রাখত, টেবিল চেয়ারের ওপরে তো চেয়ার টেবিলের ওপরে! যখন মাধ্যমিকে উঠল, ক্লাসরুমজুড়ে শোরগোল, হৈ-হুল্লোড় ও চেঁচামেচিতে ভরিয়ে রাখত। ফলে তার বিরুদ্ধে অনিয়ম, বিশৃঙ্খলা, ঝগড়া-বিবাদ, মারামারি, গালিগালাজের নানা অভিযোগ জমা পড়তে থাকে। এমনকি বাড়িতেও প্রকাশ্যে ঝগড়া বিবাদে লিপ্ত ছিল।

এভাবেই উচ্চমাধ্যমিক স্তর পেরিয়ে ভার্সিটিতে সে শরীয়া অনুষদে ভর্তি হয়। বিভাগের সবাই শৃঙ্খলা মেনে চললেও সে একাই ছিল গোঁয়ার প্রকৃতির। বিভাগের পরিচালকবৃন্দ তাকে ডেকে বোঝালেও কাজ হয়নি। সতর্ক করলেও তাতে সে কর্ণপাত করেনি। তারা উৎসাহ দিলেও সে সাড়া দেয়নি। ভয় দেখিয়েও কোনো লাভ হয়নি। সবশেষ নিরূপায় হয়ে বিভাগের উচ্চ দায়িত্বশীল তাকে ডেকে পাঠায়। তার সামনে পূর্বের সকল অনিয়মের অভিযোগ পেশ করে সাফ জানিয়ে দেয়, বিশ্ববিদ্যালয় তার কোনো দায় দায়িত্ব বহন করবে না। কর্তৃপক্ষ তাকে বহিষ্কার করে।

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যায়। বহিষ্কার হবার পর একরকম নিষ্ক্রিয় দিন যাপন করতে থাকে। এ সময়ে বড় বেশি উদ্ধত হয়ে ওঠে সে। যুবকদের সামনে পেলে আল্লাহর পথ থেকে তাদেরকে বাধা দিতে থাকে। মুসলিমদের নানা নিদর্শন নিয়ে কটাক্ষ করার চেষ্টায় থাকত। মসজিদের দরোজায় দাঁড়িয়ে সিগারেট ফুঁকত। সে কথানুযায়ী সে অন্যদেরকে দীন থেকে বিমুখ রাখতে কখনো অন্যের প্রতি চড়াও হত। এভাবেই নানা অপকর্মে তার দীর্ঘ সময় কাটতে থাকে। একবার নিজ শহর ছেড়ে অন্য একটি শহরে যায় এবং সেখানে স্বাধীন জীবন যাপন করতে শুরু করে। সেখানে একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সাথে তার সাক্ষাত হয়। উভয়ের মাঝে দীর্ঘ দিনের পুরনো বন্ধুত্ব ছিল। বন্ধুটি তাকে একটি ইসলামী ক্যাসেট দেয়, বন্ধুটির অধিক আগ্রহের দরুন এবং সময় কাটাতে বাধ্য হয়ে ক্যাসেটটি সে

নেয়। তারপর ক্যাসেটটি যখন শুনতে শুরু করে অন্তরে পরিবর্তন সৃষ্টি হয়। তার জীবন পাল্টে যায় এবং ভবিষ্যত ভিন্নদিকে মোড় নেয়।

সে মসজিদে গিয়ে নামাজে দাঁড়ায়। অতঃপর মাগরিবের নামাজের মাধ্যমে জীবনকে নতুন করে শুরু করে। ঈমানের পথে ধাবিত হয়, হৃদয় তার ঈমানী আলোয় পূর্ণ হয়ে ওঠে। সৎ বন্ধুদের সাথে ওঠাবসা করতে শুরু করে এবং তারাও তার ঘনিষ্ট হয়ে ওঠে। রাতভর কুরআন তেলাওয়াতে মশগুল থাকে এবং দিনের বেলাও অধিকাংশ সময় কুরআন পাঠ করে। হেদায়েতপ্রাপ্তির পর সভ্য ও নম্রতার অধিকারী হয়। তার এই অগ্রসরতা ও সাহসিকতা দীনের পথের একজন সহযোগীর উদাহরণ। আল্লাহর বাণী–

فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ _ وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

'অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়ার পুরস্কার এবং আখেরাতের উত্তম পুরস্কার দান করেন। আর যারা সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদেরকে ভালোবাসেন। তারা শুধু বলত, হে আমাদের রব, আমাদের পাপসমূহ এবং আমাদের কাজের সীমালঙ্ঘন আপনি মোচন করে দিন। এবং আমাদেরকে সুদৃঢ় রাখুন ও কাফেরদের বিরুদ্ধে আমাদেরকে সাহায্য করো।' *[সূরা আল-ইমরান, আয়াত ১৪৬-১৪৭]*

হে তওবা কবুলকারী! হে পাপমোচনকারী! সকল প্রশংসা শুধু আপনার। কে আছে এমন, যে আপনার কাছে ক্ষমা চেয়েছে আর আপনি ক্ষমা করেননি। কে আছে, যে আপনাকে ডেকেও আপনার সাড়া পায়নি। কে আছে, যে আপনার কাছে চেয়েও নিরাশ হয়েছে।

হেদায়াতপ্রাপ্ত দুই যুবক

একই এলাকার সমবয়সী দু'জন যুবক। তাদের একজন বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করত আর অন্যজন হাসপাতালের কর্মরত ছিল।

তারা উভয়েই দীনবিমুখ এবং দীনী বিধিবিধানের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করত। বখাটে লোকদের সাথে তাস-জুয়া খেলে রাত কাটিয়ে দিত। রাতের প্রথম প্রহর থেকে শুরু করে সকাল পর্যন্ত খেলায় মেতে থাকত! ঘরের পাশে মসজিদ থাকাসত্ত্বেও অন্তর ছিল মসজিদবিমুখ। এ সময়গুলোতে দীনের বিভিন্ন বিধিবিধান নিয়ে কটূক্তি করত। নামাজ, জিকির, আজান, সুন্নাত ইত্যাদি বিষয় ছিল তাদের কটাক্ষের বিষয়বস্তু। এমনই সীমালঙ্ঘন ও বাড়াবাড়িতে সময় কাটে তাদের।

এক রাতের কথা। আকাশে অল্প কিছু তারা ছিল আর প্রচুর পরিমাণ শিশির ঝরছিল। এমনই মোহনীয় রাতে আরামে ঘুমোচ্ছিল তাদের একজন। ঘুমের ঘোরে হঠাৎ অনুভব করে, তার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কেউ যেন আক্রমণ করে শ্বাসরোধ করার চেষ্টা করছে তার। সে ভীষণ ভয় পায়; মৃত্যু যেন তার সন্নিকটে। তার ঘুম ভেঙ্গে যায়। কিন্তু স্বপ্নের শ্বাসরোধ অনুভূতি তার কিছুতেই দূর হয় না। বাস্তবেও তা অনুভব করতে থাকে।

সে বলে, 'আমি ঘুমের ঘোরে অনুভব করি, দুটি হাত প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে যেন আমার গলা চেপে ধরছে।' এ ঘটনার মধ্য দিয়ে প্রকৃতপক্ষে সে মৃত্যুযন্ত্রণার ভয়াবহতা অনুভব করে। অন্তর্দ্বিধা চলাকালে আল্লাহর কাছে জবাবদিহিতার কথা মনে পড়ে। নিজের ভ্রষ্ট দিনগুলোর কথা স্মরণ হয়। ভুলত্রুটি, সীমালঙ্ঘন ও পাপের কথা স্মরণ করে আরও শঙ্কিত হয়ে পড়ে। দুনিয়ার স্বাদ আহ্লাদের কথা ভুলে যায় এবং সুখ স্বাচ্ছন্দের চিন্তা মন থেকে দূরীভূত হয়। প্রিয় জিনিসের আকাঙ্ক্ষাবোধ তার হারিয়ে যায় এবং আল্লাহর কাছে সে দৃঢ় ওয়াদাবদ্ধ হয়, যদি আল্লাহ তাকে এ সঙ্গিন অবস্থা থেকে মুক্তি দেন তবে পূর্বের অবস্থা থেকে ফিরে আসবে। অবশ্যই সে তার পাপাচারিতা ও সীমালঙ্ঘন থেকে তওবা করবে। তারপর তার নতুন চৈতন্যের উদয় হয় ও শ্বাসরোধ অনুভূতির অবসান ঘটে। যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পেয়ে তৎক্ষণাত সে

চিৎকার করে তওবার ঘোষণা দেয় ও কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। সে উঠে অজু করে সালাতে দাঁড়ায়। সারারাত কান্নাকাটি ও স্বীয় প্রতিপালকের নিকট দুআ ও মুনাজাতে কাটিয়ে দেয়। অতঃপর ফজরের সময় হলে মসজিদ পানে এগিয়ে চলে। প্রশস্ত বক্ষ, উন্মুক্ত চেতনা আর সমৃদ্ধ হৃদয়ের অধিকারী হয়ে। আজ যেন আমার নতুন জন্ম।

আর অশ্বারোহী দ্বিতীয় যুবকটি বিচ্যুতি ও ভ্রষ্টতার ক্ষেত্রে একেবারে তার সঙ্গীর মতো। বরং সে মাদক সেবন এবং অবলীলায় হারাম কাজ করার ক্ষেত্রে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলামের প্রচারকরা পথে পথে ও গলির মোড়ে মোড়ে প্রস্তুত হয়ে থাকে পথভ্রষ্ট হৃদয়গুলোকে সত্যের সন্ধান দিতে। তারা মানুষকে শয়তান ও তার দোসরদের কবল থেকে মুক্ত করে।

এই যুবকটি জনৈক দাঈর পাশ দিয়ে কোথাও যাচ্ছিল। দাঈ তাকে সহাস্য বদনে সালাম দেয় এবং যুবকটিকে ইবনুল কাইয়িম রচিত '*আল জাওয়াবুল কাফি লিমান সাআলা আনিদ দাওয়া-ইশ শাফি*' নামক গ্রন্থ হাদিয়া দেয়। আর গ্রন্থটি এত মূল্যবান যে, যদি তা রক্ত কিংবা অশ্রু দিয়ে রচিত হত, সেটিও তুচ্ছ গণ্য হত। যার লেখক সত্যবাদিতা, উপদেশ ও প্রভাবতায় অনন্য। যুবক এ সাক্ষাৎকালে দুটি আচরণে খুশী হয়েছিল,

এক. দাঈ'র হাসিমাখা বদনে সালাম দেয়া। দুই. দাঈ'র পক্ষ থেকে মূল্যবান গ্রন্থ উপহার পাওয়া, যা তার অন্তরে প্রাসাদসম আশা ও হৃদ্যতার তৈরি করে।

যুবকটি লেখক ইবনুল কায়্যিমের সাথে তাঁর বইয়ে চমৎকার যাত্রা শুরু করে (পাঠ শুরু করে)। কিন্তু ইবনুল কাইয়িম যুবক স্বীয় কৃতকর্মের তওবা স্বীকার করা পর্যন্ত বন্ধন ছাড়লেন না। যুবক ইবনুল কায়্যুমের সাথে গ্রন্থপাঠ অব্যাহত রাখে। একপর্যায়ে ইসলামের ভালোবাসা এবং একক সত্তা আল্লাহ ও রাসূলের আগ্রহে পূর্ণ হয়ে ওঠে। যুবকটি এখন কল্যাণ ও মর্যাদার সুউচ্চ মাকামে অধিষ্ঠিত। আল্লাহর বাণী,

أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

'আচ্ছা বলো তো, যে ব্যক্তি মুখে ভর দিয়ে উপুড় হয়ে সেই কি অধিক সৎপথপ্রাপ্ত, না সেই লোক যে সোজা হয়ে সরল সঠিক পথে চলে?' *[সূরা মুলক-২২]*

আপনার পাঠ্যানুভূতি লিখুন